বিপদাপদের কারণ ও প্রতিকার

[এতে কোরআন ও হাদীসের আলোকে বর্তমান বিপদ-বিড়ম্বনার মূল কারণ এবং সেগুলোর বাস্তবসম্মত প্রতিকার লিপিবদ্ধ হয়েছে]

রচনাঃ

আল্লামা হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আশেকে এলাহী বুলন্দশহ্‌রী

অনুবাদঃ

মাওলানা সৈয়্যদ মোহাম্মদ জহীরুল হক

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, অনুবাদক ও প্রবীণ সাংবাদিক

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজারঃ ঢাকা

অনুবাদকের নিবেদন

আল্লামা হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আশেকে এলাহী বুলন্দশহ্‌রী পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মনীষীবৃন্দের অন্যতম। তিনি অসংখ্য গ্রন্থমালার প্রণেতা। তাঁর বহু গ্রন্থ ও পুস্তক পুস্তিকা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে সারা বিশ্বে মুসলমানদের চিন্তা চেতনার অসাধারণ বিকাশ ঘটিয়েছে। যাবতীয় কুসংস্কারের মূলে সফল আঘাত হেনেছে। আজকে তথাকথিত আধুনিক ও প্রগতিশীল তথা বিপদ-শঙ্কুল পৃথিবীতে মানুষ যখন চরম হতাশায় নিমজ্জিত, তিনি তখন কোরআন হাদীস তথা ইসলামী দর্শনের আলোকে মানুষের বিপদাপদ ও হতাশার প্রকৃত কারণ ও তার সঠিক প্রতিকারের পথ দেখিয়ে চলেছে। উর্দু ভাষায় রচিত 'মুসীবতুঁ কা এলাজ' শীর্ষক পুস্তকটি তাঁর সে কল্যাণ প্রকাশেরই একটি ফলক। এতে বিধৃত হয়েছে মহানবী (সাঃ)-এর চল্লিশটি হাদীস, তার সরল তরজমা ও বিশদ ব্যাখ্যা।

প্রথম দশটি হাদীসে মানুষের বিপদ-বিড়ম্বনা ও বালা-মুসীবতের কারণ ও উপকরণসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তী সতেরটি হাদীসে রয়েছে যাবতীয় বিপদ-বিড়ম্বনার যথাযথ প্রতিকারের পন্থা এবং সৎকর্মের প্রতিদান সংক্রান্ত আলোচনা। আর তিনটি হাদীসে একই সাথে বিপদাপদের কারণ ও প্রতিকারের সমন্বিত আলোচনা।

সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মত আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরাও আজ চরম বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করছি। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক জীবনে আমাদেরও বিপদাপদের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আমাদের হতাশার দিগন্তও বিস্তৃত হচ্ছে দিনকে দিন। এমতাবস্থায় মুসলমান হিসাবে এসব হতাশার কারণ ও প্রতিকার খুঁজে বের করার প্রয়াস চালানো আমাদেরও ধর্মনৈতিক কর্তব্য। এমনি সময়ে মাওলানা মোহাম্মদ আশেকে এলাহী বুলন্দশহ্‌রীর এ গ্রন্থটি আমাদের জন্য পথিকৃতের ভূমিকা পালন করতে পারে। সে লক্ষ্যেই বাংলাভাষী মুসলমানদের

উদ্দেশে "বিপদাপদের কারণ ও প্রতিকার" নামে এর সরল অনুবাদ পেশ করছি। আশা করছি, আজকের হতাশাগ্রস্ত মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন ও বিপদাপদের প্রতিকারে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

আল্লাহ্ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবার নেক উদ্দেশ্য-সমূহকে কবুল করুন। আমীন!

বিনীত—
সৈয়্যদ মোহাম্মদ জহীরুল হক

১১/২, কবি জসীম উদ্দীন রোড
কমলাপুর, ঢাকা।

সূচীপত্র

■

বিপদাপদের কারণ ও প্রতিকার

সূচনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ○

বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু-সামগ্রীর নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতী হাতে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম ছাড়া আকাশ থেকে কোন মানুষের উপর কোন বিপদ নেমে আসতে পারে না, এ ভূমণ্ডল তার পৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন প্রাণীকে কোন কষ্টও দিতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম ছাড়া না বিদ্যুৎ চমকাতে পারে আর না-ইবা শিলা বর্ষিত হতে পারে। না তলোয়ারের আঘাত করার ক্ষমতা আছে, আর না আগুনের আছে দহনশক্তি। বায়ুরও নেই উড়িয়ে নেয়ার সাহস। যে পর্যন্ত সর্বময় ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারীর হুকুম না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত না পানি ভাসিয়ে নিতে পারে, না দেখা দিতে পারে দুর্ভিক্ষ। না দৈন্য-দারিদ্র্য, ভয়-শঙ্কা ও নৈরাজ্য প্রকাশ পেতে পারে, না জ্বলে উঠতে পারে দাঙ্গা-হাঙ্গামার আগুন। মোটকথা, বিশ্বের কোন বস্তুই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। কাউকে সুখ বা দুঃখও দিতে পারে না।

দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ্র বান্দারা যখন নিজেদের মালিকের বশ্যতা ও আনুগত্য করতে থাকে, তখন তিনি তাঁর একান্ত করুণার মাধ্যমে বান্দাদের প্রতি দয়া করতে থাকেন। ভূমি ও আকাশের বরকতের দরজা খুলে দেন। খুন-যখম, ভয়ভীতি ও দৈন্য-দারিদ্র্যের অবসান ঘটিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ জীবন দান করেন। আখেরাতে আনুগত্যের যে প্রতিদান ও উপঢৌকন পাওয়ার তাতো মিলবেই, এছাড়া পৃথিবীতেও সৎকর্মের প্রতিদান পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط —— نور آيت ٥٥

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করবে তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেন যে, পৃথিবীতে তিনি তাদেরকে খেলাফত (শাসন কর্তৃত্ব) দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে দান করেছিলেন। আর যে দ্বীনকে আল্লাহ্ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন (অর্থাৎ, ইসলাম), তাকে তাদের জন্য দৃঢ় করবেন এবং তাদের সে ভীতিপূর্ণ অবস্থার পরিবর্তন করে তাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিণত করে দেবেন। (সূরা নূর, আয়াত ৫৫)

সূরা আ'রাফে বিগত কয়েকটি জাতির ধ্বংসের কথা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○
—— اعراف آيت ٩٦

যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান নিয়ে আসত এবং (আমাকে) ভয় করত, তাহলে তাদের জন্য আসমান ও যমীনের প্রাচুর্যের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু ওরা (নবীদেরকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদের (সেসব মন্দ) কর্মের দরুন তাদেরকে পাকড়াও করেছি। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ৯৬)

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, শেষ যমানায় যখন হযরত ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হবেন, তখন দাজ্জাল ও ইয়াজূজ মাজূজের ধ্বংস হয়ে যাবার পর (আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে) ভূমিকে লক্ষ্য করে বলা হবে, নিজের ফল-ফসল উৎপন্ন কর এবং নিজের বরকত ফিরিয়ে দাও অর্থাৎ, বের করে দাও। সুতরাং ভূমির বরকতসমূহ বেরিয়ে আসবে এবং (তখন) একটি আনার দিয়ে বিশাল একদল লোকের পেট ভরে যাবে এবং এক দল লোক আনারের বাকল দ্বারা ছাতা বানিয়ে তা মাথায় দিয়ে চলতে পারবে। (অতঃপর বললেন) দুধেও বরকত দেয়া হবে। এমন কি একটি উটনীর দুধ বিরাট একদল লোকের জন্য, একটি গাভীর দুধ একটি গোষ্ঠীর জন্য এবং একটি ছাগীর দুধ একটি ছোট গোষ্ঠীর জন্য যথেষ্ট হবে।

অন্য এক হাদীসে আছে, নবী করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ اَنَّ عَبِيْدِىْ اَطَاعُوْنِىْ لَاَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِالَّيْلِ وَاَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمْ اُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ —— رواه احمد

তোমাদের পালনকর্তা বলেছেন, আমার বান্দারা যদি আমার আনুগত্য করত, তাহলে আমি (শুধু) রাতের বেলায় বৃষ্টি বর্ষণ করতাম এবং দিনের বেলায় (বরাবর) সূর্য উদিত করতাম এবং তাদেরকে বিদ্যুৎ গর্জন শোনাতাম না। (মুসনাদে আহমদ)

পক্ষান্তরে আল্লাহ্র বান্দারা যদি নিজেদের স্রষ্টা ও প্রভুর নাফরমানী (বিরুদ্ধাচরণ) করতেই থাকে এবং তাঁর দেয়া নেয়ামতসমূহ ব্যবহার করার পর অকৃতজ্ঞতায় মেতে থাকে, তাহলে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্—যাবতীয় বস্তু-সামগ্রীর উপর যাঁর নিরবচ্ছিন্ন অধিকার রয়েছে এবং দয়ালু, প্রতিশোধ গ্রহণকারী, পরাক্রমশালী, অহংকারী, এক ও অভিন্ন এবং কাহ্হার যাঁর বৈশিষ্ট্য তিনি—নিজের সৃষ্টিকে সতর্ক করে দেন এবং বিপদ-বিড়ম্বনার সাঁড়াশিতে আঁকড়ে ফেলেন।

সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّ اَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ○ انبياء آيت ١١

আর আমি বহু জনপদকে গুড়িয়ে দিয়েছি যারা ছিল জালেম আর তাদের স্থলে সৃষ্টি করে দিয়েছি অন্য লোকদেরকে। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১১)

সূরা তালাকে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ○ فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ○ طلاق آيت ٧-٨

অনেক জনপদ যখন তাদের পালনকর্তা ও রাসূলের নির্দেশ ডিঙ্গিয়ে চলেছে, তখন আমি তাদের কাছ থেকে হিসাব নিয়েছি, কঠিন হিসাব; তাদের উপর অদৃশ্য বিপদ আরোপ করেছি। ফলে সেসব জনপদ নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতি আস্বাদন করে নিয়েছে এবং তাদের পরিণতি হয়েছে ক্ষতিকর। (সূরা তালাক, আয়াত ৭ ও ৮)

সূরা হজ্জে বলা হয়েছেঃ

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍمَّشِيْدٍ ○ حج أيت ٤٥

বস্তুত বহু জনপদ আছে যেগুলোকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি এবং সেগুলো ছিল জুলুমকারী। সুতরাং সেগুলো এখন তাদের ছাদগুলোর উপর বিধ্বস্ত পড়ে আছে। তাছাড়া কত যে কুয়ো পড়ে আছে অকেজো হয়ে, কত যে পাকা প্রাসাদ পড়ে আছে বিরান-বিজন। (সূরা হজ্জ, আয়াত ৪৫)

কোরআনে হাকীম বিগত উম্মতসমূহের ধ্বংস ও বিনাশের কাহিনী সতর্কীকরণ ও স্মারক হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করেছে। সেগুলোর কোনটিকে মাটিতে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে, আবার কোন উম্মত সাগরে ডুবে গেছে, কোনটির উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে, কোনটিকে বজ্রনিনাদ বিনাশ করেছে, কোনটির উপর এসেছে জলোচ্ছ্বাস, কোনটিকে নিঃশেষ করেছে ঝড়। অন্তর্দৃষ্টির অধিকারীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য এসব কাহিনী যথেষ্ট।

এক হাদীসে আছেঃ

اِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهٗ

নিঃসন্দেহে মানুষকে পাপ করার কারণে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়।

অন্য আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হযরত মুআয ইবনে জবল (রাঃ)-কে ওসিয়ত প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

اِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللهِ — مشكوة

গুনাহ্ থেকে বাঁচ। কারণ, গুনাহ্র দরুন আল্লাহ্র অসন্তোষ নেমে আসে। (মেশকাত)

ইদানীং মানুষের অপকর্ম যে পরিমাণে বেড়ে চলেছে, সে পরিমাণে বিপদাপদও বাড়ছে। কোন দল বা ব্যক্তির দ্বারা বিপদাপদের অবসান হবে না; বরং এজন্যে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য এবং তাঁর দরবারে বিনয়সহকারে কাঁদাকাটার প্রয়োজন।

যে জাতি এখনও আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা থেকে বিরত হবে না, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করবে না, ধনসম্পদের গর্বে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করবে, তার নিশ্চিত বিশ্বাস করা উচিত যে, সে নিজেই নিজের ধ্বংস ও বিনাশের ব্যবস্থা করছে। সূরা আনআমে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেনঃ

فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ط حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْآ اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ○ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ط — انعام أيت ٤٣-٤٤-٤٥

তাদের উপর আমার আযাব নেমে আসার পরেও কেন কান্নাকাটি করছে না; বস্তুত তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেছে এবং শয়তান তাদের অপকর্মকে তাদের (চোখে) সুদৃশ্য করে তুলে ধরেছে। সুতরাং যখন তারা তাদেরকে প্রদত্ত উপদেশ ভুলে গেছে, তখন আমি তাদের জন্য খুলে দিয়েছি যাবতীয় বিষয়ের দরজা। এমন কি যখন তারা প্রদত্ত নেয়ামতরাজির জন্য ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে শুরু করেছে, তখন আমি আকস্মিকভাবে তাদেরকে পাকড়াও করে নিয়েছি। অতএব, তখন তারা নিরাশ হয়ে রয়ে গেছে। বস্তুত কেটে দেয়া হয়েছে জালেমদের মূল (অর্থাৎ, তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে)। (সূরা আনআম, আয়াত ৪৩, ৪৪ ও ৪৫)

এসব আয়াতে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সতর্ক করা হলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে তাদের মনোনিবেশ করা উচিত। যদি তারা অন্তরের কঠোরতা অবলম্বন করে এবং শয়তানের প্ররোচনায় এসে যায়, তাহলে কঠোরভাবে ধরা পড়ে যাবে। তাছাড়া আরও জানা গেল যে, প্রচুর পরিমাণ ধন-সম্পদ ও জীবিকা উপার্জন প্রাপ্তির দরুন আল্লাহ্কে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আর পাপে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও ধন-সম্পদ পাওয়া গেলে একে সাফল্য ও গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ বলে মনে করা সঙ্গত নয়; বরং একে আকস্মিক ধরা পড়ারই পূর্বাভাস মনে করা কর্তব্য। সুখ হোক কি বিপদ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি নিবিষ্ট থাকা প্রয়োজন।

হযরত ওবাদা (রাঃ) হুযূর (দঃ)-এর বাণী উদ্ধৃত করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতিকে এগিয়ে নিতে চান, তখন তাতে ভারসাম্য ও পবিত্রতা সৃষ্টি করে দেন। পক্ষান্তরে যখন কোন জাতিকে বিলুপ্ত করে দেয়া তাঁর উদ্দেশ্য হয়, তখন তাতে খেয়ানত (অবিশ্বস্ততা)-এর দরজা খুলে যায়। তারপর যখন সে জাতি এ আচরণে নিতান্ত আনন্দিত হতে থাকে, তখন আকস্মিকভাবে তাদের উপর আযাব চেপে বসে। একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, যাকে বিত্ত দান করা হয়, অথচ সে একথা বুঝে না যে, এটি তার ধ্বংসের পূর্বাভাস, সে লোক বুদ্ধিমান নয়। আবার যে লোক

অভাব-অনটনে পতিত হল অথচ সে বুঝে না যে, এটি তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তনের অবকাশস্বরূপ, সে-ও বুদ্ধিমান নয়।

সারকথা, বিপদাপদ হল মানুষের নিজের কৃত অপকর্মের পরিণতি ও ফল।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, বান্দার দেহে যে কোন সাধারণ ক্ষত সৃষ্টি হলে কিংবা তার চাইতেও অল্প বা অধিক কোন কষ্ট হলে, তা শুধু তাদের পাপের কারণেই হয়ে থাকে। আর যেসব পাপতাপ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেন, তার পরিমাণ অনেক বেশী। (অর্থাৎ, প্রত্যেক পাপের পরিণতিতেই বিপদের সম্মুখীন করা হয় না। অধিকাংশ পাপই ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর বিপদাপদের এই যে পাহাড় পরিলক্ষিত হয়, সেগুলো কিছুমাত্র পাপের পরিণতি।) অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) (নিজের বাণীর সমর্থনে) নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন—

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

অর্থাৎ, তোমাদের উপর যে কোন বিপদ পতিত হয়েছে, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই পরিণতি। আর অনেক সময় বহু পাপ (তো) ক্ষমা(-ই) করে দেয়া হয়।

বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে সমৃদ্ধ এ ভূমিকার মাধ্যমে প্রকৃষ্টভাবে বুঝা গেল, এ পৃথিবীর বিপর্যয় আর পৃথিবীবাসীর বিপদাপদ ও দুঃখ-দুর্দশা সবই আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতার পরিণতি। যদি আল্লাহ্র বান্দারা নিজেদের পালনকর্তার আনুগত্য অবলম্বন করে, তাহলে দুরবস্থার অবসান হয়ে যাবে এবং শান্তি-স্বস্তি, আরাম-আয়েশ, সম্মান-সমৃদ্ধি ও ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। মোটকথা, মূলনীতি রয়েছে যে, এ বিশ্বের গঠন ও বিনাশ মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও নাফরমানীর মধ্যে নিহিত। এ মূলনীতি কোরআনের অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে সরাসরিভাবে কিংবা ইশারা-ইঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক হাদীসে আংশিকভাবে কোন কোন অপকর্মের বিশেষ ধরনের শাস্তি এবং কোন কোন সৎকর্মের বিশেষ ধরনের প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে। এ পুস্তকটি এমনি ধরনের হাদীস সম্বলিত। এ প্রসঙ্গে প্রচুর অন্বেষণ-অনুসন্ধানের পর চল্লিশটি হাদীস, তরজমা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

এসব হাদীসের মধ্যে প্রথমে সেগুলোকে স্থান দেয়া হয়েছে, যাতে আযাব ও বিপদাপদের কারণসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা বিশটি। তারপর সংগ্রহ করা হয়েছে সেসব হাদীস, যেগুলোতে বিপদাপদের প্রতিকার পদ্ধতি এবং সৎকর্মের বিশেষ বিশেষ প্রতিদানের উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর সংখ্যা সতেরটি।

এছাড়া কোন কোন হাদীসে বিপদ-বিড়ম্বনার কারণ এবং তার প্রতিকার উভয় বিষয়ই উল্লেখ রয়েছে। আমার নিজের নগণ্য বিবেচনার আলোকে এ হাদীসগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে প্রথম পর্যায়ে এবং কোনটাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে উদ্ধৃত করেছি।

পার্থিব বিপদ-বিড়ম্বনাও অনেক সময় মু'মিন বান্দাদের জন্য তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা গুনাহ্র কাফ্ফারা হিসাবে রহমত বা আশীর্বাদ হয়ে যায়। সুতরাং এ প্রসঙ্গে কোন কিছু লেখা না হলে পুস্তকের বিষয়বস্তু পূর্ণতা লাভ করে না বিধায় এ বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট তিনটি হাদীস পুস্তকটির শেষ পর্যায়ে তুলে ধরে চল্লিশ হাদীসের সংখ্যা পূর্ণ করে দিয়েছি।

তের বছর পূর্বে এ পুস্তকের দু'তিনটি (উর্দূ) সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। ভারত বিভাগের পর আকস্মিকভাবে যেসব দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তাতে প্রভাবিত হয়েই এ পুস্তক লেখা হয়েছিল। তখন পুস্তকটি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। হাদীসগুলোর শুধু অর্থই তাতে ছিল, অবস্থা, পরিস্থিতি ও কর্ম সংক্রান্ত বিশ্লেষণ ছিল খুবই অল্প। অবশ্য হাদীসগুলোর মূল ভাষ্য ও তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ প্রকাশ করার একটা মানসিক তাকাদা তখনও ছিল। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থাদি প্রণয়ন এবং শিক্ষা ও তবলীগী ব্যস্ততার দরুন তা আর হয়ে উঠেনি। সম্প্রতি সামান্য অবসর পেয়ে একে নতুন আঙ্গিকে সাজানোর দীর্ঘদিনের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হলো। এবারকার সজ্জা ও বিন্যাসে আমার দ্বীনী ভাই মওলভী হুসাইন আহমদ আ'জমী মাযাহেরী বিপুল সহযোগিতা করেছেন। পাঠকবর্গের প্রতি বিনীত প্রার্থনা, তারা যেন আমাকে এবং আমার বিজ্ঞ ভাইকে তাঁদের দো'আয় স্মরণ করেন।

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَآ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অনন্ত রহমতের প্রত্যাশীঃ
মোহাম্মদ আশেক এলাহী বুলন্দ শহ্‌রী
(আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করুন।)
কলিকাতা, জুমাদাল উলা ১৩৮০ হিঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায ছেড়ে দিলে আল্লাহ্‌র দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়

وَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَّاِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلٰوةً مَّكْتُوْبَةً مُّتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَاتَشْرَبِ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ —— رواه ابن ماجة

(১) হযরত আবুদ্দর্দা (রাঃ) বলেন, আমার বন্ধু [রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)] আমাকে ওসিয়ত করেছেন যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করো না, তোমাকে (কেটে) টুকরো টুকরো করে ফেলা হলেও এবং তোমাকে জ্বালিয়ে ফেলা সত্ত্বেও। আর ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায পরিহার করো না। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায ছেড়ে দিলে তার উপর থেকে (আল্লাহ্ তা'আলার) দায়িত্ব উঠে যায়। তাছাড়া মদ্য পান করো না। কারণ, এ হল যাবতীয় অপকর্মের চাবিকাঠি। (ইবনে মাজাহ্)

জ্ঞাতব্যঃ আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব উঠে যাবার অর্থ হল, এখন থেকে তাকে পৃথিবী ও আখেরাতে নিরাপত্তা ও শান্তি-স্বস্তিতে রাখার দায়দায়িত্ব আল্লাহ্ তুলে নিলেন। তার শত্রুরা তার প্রতি যা ইচ্ছা তাই করুক।

এ হাদীসের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, নিয়মিতভাবে নামায আদায় বান্দাকে আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্বে তুলে দেয়। (পক্ষান্তরে) কোন বান্দা ইচ্ছাকৃত ও জেনে-বুঝে ফরয নামায ছেড়ে দিলে আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব (তথা নিরাপত্তা ব্যূহ) থেকে বেরিয়ে যায় এবং তখন সে নিজের ও সৃষ্টির দায়িত্বে থেকে যায়। এখন তার যে কোন দুরবস্থা ঘটলে ঘটতে পারে; স্রষ্টা ও মালিকের নিরাপত্তা থেকে সে বহির্ভূত।

এখন আমরা নিজেদের অবস্থারও খানিকটা পর্যালোচনা করে দেখতে পারি। আমাদের বাড়িতে, কার্যালয়ে, হাটবাজারে, ব্যবসায়িক ব্যস্ততায় আমরা নামাযের

কতটা আয়োজন করি? আমাদের জামানতে নামাযীর সংখ্যা অতি নগণ্য আর বেনামাযী অসংখ্য। নামাযীদের অবস্থাও আবার এমন যে, নিবাসে-প্রবাসে কিংবা রোগ-ব্যাধিতে নিয়মিত নামায আদায়কারী নিতান্ত অল্প। মানুষে ভর্তি পৃথিবীর এ দঙ্গলে (ভীড়ে) প্রতিদিন শত শত কোটি নামায নষ্ট করা হয়। এমন সব মানুষ কি আল্লাহ্ তা'আলার নিরাপত্তা ও আশ্রয়ে থাকার যোগ্য? শুধু যে নামায ছেড়ে দেয়া হয় তাই নয়; বরং নামাযীদেরকে নামায ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। নামাযের প্রতি উপহাস করা হয়। মুসলমান কর্মকর্তাদের অধীনে এবং মুসলমান পুঁজিপতিদের চাকরিতে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের পক্ষে নামাযীরূপে টিকে থাকা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়।

রইল নাফরমান বড়লোকদের কথা (যারা নিজেদের কৃতকর্মের দরুন আখে-রাতে ছোটলোকই হবে,) তাদের তো নামায পড়ার অবসরই নেই। তাদের কাছে পাপাচারী হওয়াই মর্যাদার মানদণ্ড। কোন লোক যদি নামায আদায় করার সাহস করে, তাহলে সময়ে অসময়ে কুঠি-বাংলোতেই অতি কষ্টে দু'চার মিনিট সময় বের করে অল্পবিস্তর পড়ে নেয়, মসজিদে গিয়ে সাধারণ মুসলমানদের কাতারে দাঁড়িয়ে নামায পড়া তাদের কাছে নিতান্তই অপমানকর মনে হয়। আফসোস তাদের প্রতি! এমনিতে তো সব শ্রেণীর মাঝেই কিছু না কিছু নামাযী থাকে; কিন্তু সমগ্র জগতের শান্তি ও স্বস্তি লাভের জন্য হাতে গোনা কতিপয় লোকের ভাল হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট নয়। অবশ্য তারা নিজেদের সৎকর্মের প্রতিদান আখেরাতে প্রাপ্ত হবে।

উল্লিখিত এ হাদীসে মদ্যপানও নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং মদকে যাবতীয় পাপের চাবিকাঠি বলা হয়েছে। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলে করীম (দঃ) মদের প্রতি, মদ্যপায়ীর প্রতি, মদ্য পরিবেশকের প্রতি, মদ্য প্রস্তুতকারীর প্রতি, যে মদ্য প্রস্তুত করায় তার প্রতি, মদ্য বহনকারীর প্রতি এবং যার কাছে মদ্য সরবরাহ করা হয় তার প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। (মেশকাত) আমাদের দেশে কি পরিমাণ মদ চলে সে বিষয়টিও লক্ষ্যণীয়। ব্যক্তিগতভাবে এবং পার্টিসমূহে সমষ্টিগতভাবে কি পরিমাণ মদ পান করা হয় এবং পান করানো হয়! শেষ নবী (দঃ)-এর ভাষ্য অনুযায়ী কত অসংখ্য মানুষ মদের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাত ও ধিক্কারের সম্মুখীন! আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও উন্নতি, অগ্রগতি আর মুক্তি ও কৃতকার্যতার আশা করা কি অবান্তর নয়?

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছেঃ اَلْخَمْرُ جُمَّاعُ الْاِثْمِ অর্থাৎ, মদ হল সমস্ত পাপের সমষ্টি। (মেশকাত)

মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, মাদকতা সৃষ্টিকারী যাবতীয় বস্তু হারাম। নিঃসন্দেহে মাদকতা উদ্রেককারী বস্তু সেবনকারীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অঙ্গীকার রয়েছে যে, তাকে তিনি طِيْنَةُ الْخَبَالِ (তীনাতুল খাবাল) পান করাবেন। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তীনাতুল খাবাল কি জিনিস? মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তীনাতুল খাবাল হল দোযখীদের ঘাম কিংবা দোযখীদের দেহের বর্জ্য। (মেশকাত)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সমগ্র জগৎ-সংসারের জন্য রহমত (কল্যাণ) ও হেদায়ত (সৎপথের দিশারী) বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমার পালন-কর্তা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমি গানবাদ্যসামগ্রী, মূর্তি-বিগ্রহ, ক্রুস বা ক্রুসেড এবং জাহেলিয়াতের বিষয়গুলো বিনাশ করে দেই। তাছাড়া আমার পালনকর্তা নিজের মর্যাদার কসম খেয়েছেন যে, আমার বান্দাদের মধ্যে যে বান্দা মদের একটি ঢোক পান করবে, তাকে সে পরিমাণ (জাহান্নামীদের দেহ থেকে নির্গত) পুঁজ পান করাব। আর আমার ভয়ে যে বান্দা মদ্য পরিহার করবে, তাকে পূত-পবিত্র হাউজ (কাউসার) থেকে (পানি) পান করাব। (মুসনাদে আহমদ)

এক হাদীসে আছে, যে বস্তুর অধিক মাত্রা মাদকতা সৃষ্টি করে তার অল্প (পরিমাণ পান করা)-ও হারাম। (তিরমিযী)

এসব ভীতিবাক্যগুলো এবং বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন, অতঃপর চিন্তা করে দেখুন, আজকের মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভের কতটা হকদার?

বান্দাগণ অবাধ্য হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর অত্যাচারী শাসক চাপিয়ে দেন

وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مَالِكُ الْمُلُوْكِ وَمَلِكُ الْمُلُوْكِ قُلُوْبُ الْمُلُوْكِ فِىْ يَدِىْ وَاِنَّ الْعِبَادَ اِذَا اَطَاعُوْنِىْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَ مُلُوْكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ وَ اِنَّ

الْعِبَادَ اِذَا عَصَوْنِىْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَهُمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ فَسَامُوْهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ فَلَا تَشْغَلُوْا اَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوْكِ وَلٰكِنْ اَشْغِلُوْا اَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كَىْ اَكْفِيَكُمْ —— رواه ابو نعيم فى الحلية

(২) হযরত আবুদ্দর্দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমি সমস্ত সৃষ্টির উপাস্য, আমাকে ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি রাজন্যবর্গের অধিপতি, সম্রাটদের সম্রাট। রাজাদের অন্তর আমার নিয়ন্ত্রণাধীন। বান্দাগণ যখন আমার আনুগত্য করে, তখন তাদের রাজা-বাদশাহদের অন্তরকে রহমত ও করুণার সমন্বয়ে তাদের দিকে ঘুরিয়ে দেই। আর যখন বান্দারা আমার অবাধ্যতা অবলম্বন করে, তখন রাজা-বাদশাহদের অন্তরকে রাগ ও কঠোরতার দিকে ঝুঁকিয়ে দেই, যার ফলে তারা প্রজাদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করায়। সুতরাং হে বান্দাগণ! তোমরা রাজা-বাদশাহদের জন্য বদ দো'আ করো না; বরং আমার স্মরণে আত্মনিয়োগ কর এবং আমার সামনে কান্নাকাটি করতে থাক; আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হব। (অর্থাৎ, আমি তোমাদের সাহায্য করব। রাজা-বাদশাহ তথা শাসনকর্তাদের অন্তরে করুণা সঞ্চার করে দেব।)

(আবু নোআইম হিলইয়া গ্রন্থে)

এক হাদীসে আছে, তোমরা যেমন হবে, তোমাদের উপর বাদশাহ তথা শাসন -কর্তাও তেমনি চাপিয়ে দেয়া হবে। (মেশকাত) অর্থাৎ, তোমরা যদি সৎ ও সৎকর্মী হও, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সৎ ও দয়ালু বাদশাহ নিয়োগ করবেন। আর যদি তোমরা অসৎ ও অবাধ্য হও, তাহলে তোমাদের উপর বাদশাহও অসৎ, ফাসেক-ফাজের ও জালেম নিয়োগ করে দেয়া হবে।

এ দু'টি হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, জালেম ও অত্যাচারী শাসনকর্তা চাপানো হয় মানুষের অপকর্মের শাস্তি হিসাবে। শাসন কর্তৃপক্ষ যেসব অন্যায়-অত্যাচার করে, তার প্রতিফল দুনিয়া ও আখেরাতে তারা পাবে। কিন্তু জনসাধারণের জন্য তাদের অত্যাচার, উৎপীড়ন (জনগণের) অপকর্মের শাস্তিরূপেই আরোপিত হতে থাকে। আজকের পৃথিবী দাঙ্গা-ফাসাদে পরিপূর্ণ। শাসকরা জনগণের প্রতি এবং জনগণ শাসকদের প্রতি অসন্তুষ্ট। শাসনকর্তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য নানারকম পন্থা উদ্ভাবন করা হয় , নানারকম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কখনও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, নির্বাচনে অমুক দলকে ক্ষমতায় আনতে পারলে

শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে, আবার কখনও অন্য কোন পন্থায় বিপ্লব ঘটিয়ে নতুন লোক কিংবা নতুন দলের হাতে ক্ষমতা ও শাসনকর্তৃত্ব অর্পণ করে শান্তি ও নিরাপত্তার আশা করা হয়; কিন্তু পরিণতিতে সমস্ত চেষ্টা-পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর মূল কারণ তা-ই যা হাদীসে বলা হয়েছে।

সাধারণ-অসাধারণ, ছোট-বড় (ইতর-ভদ্র) সবাই আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকবে আর শাসকদেরকে পাল্টাতে থাকবে, এভাবে কস্মিনকালেও অবস্থা ভাল হবে না, শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অবনত হলে এবং কান্নাকাটি করলেই ভাল শাসক ভাগ্যে জুটতে পারে।

ব্যভিচারের কারণে দুর্ভিক্ষ এবং ঘুষের কারণে ভীরুতা ও আতংক ছড়িয়ে পড়ে

وَعَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَّظْهَرُ فِيْهِمُ الزِّنَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَّظْهَرُ فِيْهِمُ الرُّشَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ — رواه احمد

(৩) হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে জাতির মাঝে ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে, তাদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে পাকড়াও করা হয়, আর যাদের মাঝে উৎকোচ বিস্তার লাভ করে, তাদেরকে পাকড়াও করা হয় ভীতি ও আতঙ্কের মাধ্যমে। (মুসনাদে আহমদ)

এ হাদীসটিতে দু'টি অপকর্মের দু'রকম অশুভ পরিণতির কথা উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, ব্যভিচারের ব্যাপকতা দুর্ভিক্ষ তথা আকাল পড়ার কারণ। দ্বিতীয়তঃ ঘুষের লেনদেন মনে আতঙ্ক সৃষ্টির কারণ। যদি বর্তমান যুগের লোকদের ব্যাপারে হালকা ভাবেও জরিপ করা যায়, তাহলে জানা যাবে, ব্যভিচার ও ঘুষের বাজার

অত্যন্ত জমজমাট। তারপর এ দু'টির পরিণতিতে আকাল পড়া এবং মনে ভয় ও আতঙ্ক চেপে বসার ব্যাপারটিও গোপন নয়; সবারই চোখের সামনে স্পষ্ট। পতিতালয়ে যে ব্যভিচার হয় তা তো সবারই জানা। এছাড়া বিভিন্ন শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোতে যেসব ব্যভিচার হয়, সেগুলো সম্পর্কেও যাদের জানার তারা জানে। সুতরাং প্রতিদিন চব্বিশ ঘন্টায় সারা পৃথিবীতে কি পরিমাণ নারী-পুরুষ কতবার ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে, তার অনুমান করার পর চিন্তা করে দেখুন, পৃথিবীর এই জনসংখ্যা বেঁচে থাকার যোগ্য কিনা? এটা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত করুণা যে, তিনি গোটা বিশ্বকে বিলীন করে দেয়ার পরিবর্তে এলাকাভিত্তিক দুর্ভিক্ষ দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে থাকেন।

সাম্প্রতিক পৃথিবীতে ব্যভিচার এবং এর আবেদনগুলো শিল্পকলায় পরিণত হয়ে গেছে, ফ্যাশন ও স্টাইলের অংশে রূপান্তরিত হয়ে সাধারণ রেওয়াজ হিসাবে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। এছাড়া উভয় পক্ষ স্বেচ্ছায় ব্যভিচার করলে তাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না। এমতাবস্থায় মানুষ কেমন করে আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের হকদার বা অধিকারী হতে পারে?

এমনিভাবে ঘুষের ব্যাপারটি লক্ষ্যণীয়। জনসাধারণের এমন কোন্ কাজটি আছে যেগুলো বিনা ঘুষে সম্পন্ন হতে পারছে? কর্মকর্তা কিংবা করণিককে নগদ টাকা-পয়সা, ফলমূল কিংবা উপহার-উপঢৌকন না দিয়ে কোন কাজই হয় না। ইদানীং তো বিড়ি-সিগারেট পর্যন্ত ঘুষ হিসাবে চলছে। ঘুষ নাম থেকে বাঁচার জন্য এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে যে, সিগারেটের গোটা প্যাকেট দেয়া হয় না; দাতা প্যাকেটের ভেতর থেকে একটি সিগারেট বের করে নিয়ে বাকীটা টেবিলের উপর ফেলে চলে যায়। এমনি ধরনের আরও বহু পন্থা প্রচলিত রয়েছে (ঘুষ দেয়া-নেয়ার)। হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ঘুষ দাতা, ঘুষ গ্রহীতা এবং ঘুষ দানে সাহায্যকারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। (মেশকাত)

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কারও জন্য কোন সুফারিশ করে এবং ঐ ব্যক্তি সুফারিশকারীকে কোন উপহার দেয় এবং সে তা গ্রহণও করে নেয়, তাহলে সে সুদের দরজাগুলোর মধ্য থেকে একটি বড় দরজায় চলে গেল। (আবু দাঊদ)

অর্থাৎ, সুফারিশ করার বদলে কোন উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা হলে, তা সুদ গ্রহণেরই সমান। এই হাদীসের দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হল যে, নামের পরিবর্তন

করে নিলেই আসল বস্তু বদলে যায় না। ঘুষের নাম উপহার রাখলেও তা ঘুষই থেকে যায়। ফেকাহবিদগণ লিখেছেন, কোন লোক কোন কর্মকর্তাকে তার পদ লাভের পূর্ব থেকে আত্মীয়তা কিংবা বন্ধুত্বের খাতিরে কোন কিছু নিয়ে দিয়ে থাকলে তা হবে উপহার। পক্ষান্তরে পদ লাভের পরে কেউ কিছু দিতে আরম্ভ করলে, তা সবই ঘুষ।

মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ইবনে লুতবিয়্যাহ্ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠান। যাকাত আদায় করে এসে লোকটি নিবেদন করল, এগুলো হল তোমাদের (অর্থাৎ, বাইতুল মালের অংশ) আর এগুলো আমাকে উপহার হিসাবে দেয়া হয়েছে। লোকটির কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) একটি ভাষণ দান করলেন। হামদ ও সালাতের পর তিনি বললেন, "আমি তোমাদের মধ্য থেকে কোন কোন লোককে সেসব কাজের জন্য নিযুক্ত করি যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মুতাওয়াল্লী (তত্ত্বাবধায়ক) বানিয়েছেন। কিন্তু তাদের একজন এসে বলে, এগুলো তোমাদের আর এগুলো আমাকে উপহার হিসাবে দেয়া হয়েছে। লোকটি নিজের পিতা কিংবা মাতার ঘরে গিয়ে বসে থাকল না কেন? তাহলেই দেখতে পেত তাকে উপহার দেয়া হয় কিনা।"

নিজের পিতা কিংবা মাতার ঘরে গিয়ে বসে থাকল না কেন? বাক্যটির দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যেসব বস্তু-সামগ্রী পদমর্যাদার দরুন পাওয়া যাবে, সেগুলো সবই হবে ঘুষ। (নাঊযুবিল্লাহ্)

হারাম বস্তুর নাম পাল্টে কিংবা তার অন্য কোন আকার গঠন করে হালাল বানিয়ে নেয়ার প্রচলন এ উম্মতের পূর্ববর্তী (উম্মত)-দের মাঝেও ছিল। বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত এক রেওয়ায়তে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, ইহুদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত হোক। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য যখন চর্বি ব্যবহার হারাম করে দেন, তখন ওরা সেটিকে সুন্দররূপে (অর্থাৎ তেলে) রূপান্তরিত করে বিক্রি করল এবং তার মূল্য ভোগ করল। (মেশকাত)

এই ঘুষের লেনদেনের পরিণতিতে আতঙ্কগ্রস্ততার অবস্থা এমনি দাঁড়ায় যে, মানুষ সাধারণ সংবাদে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সামান্য আওয়াজে বুক কাঁপতে থাকে। কেউ যদি এ গুজব রটিয়ে দেয় যে, শত্রু আক্রমণ করতে যাচ্ছে, তাহলে প্রতিরোধ ও মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈরি হওয়ার পরিবর্তে তর্কে গিয়ে কানাকানি করতে থাকে। পক্ষান্তরে অবস্থা যখন সবদিক দিয়ে অনুকূল থাকে, শান্তি-স্বস্তিতে কাটতে থাকে, তখন বড় বড় কথা বলতে থাকে এবং আলেম-ওলামায়ে কেরামকে

গাল-মন্দ করতে গিয়ে বলতে শুরু করে যে, এরা যদি জেহাদের ফতোয়া দেয়, তাহলে আমরা এমন জেহাদ করব এবং ওমন কৃতিত্ব দেখাব! কিন্তু যখনই যুদ্ধ করার কিংবা দৃঢ়তা প্রদর্শনের সুযোগ আসে, তখন (এসব) বাগাড়ম্বরকারীরা সবাই পালিয়ে যায়।

দিল্লীর একটি ঘটনা আমি শুনেছিলাম, একবার নাকি একটি বিড়াল টিনের উপর লাফিয়ে পড়ে। তার লাফের শব্দে এক সাহেবের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি একে শত্রুর আক্রমণ ভেবেই 'না'রায়ে তকবীর' শ্লোগান দিতে আরম্ভ করেন। এ শ্লোগানে পাড়ার লোকেরাও হতচকিত হয়ে শ্লোগান দিতে শুরু করে দেয়। বিরাট হৈ-চৈ পড়ে যায়। পরে অনুসন্ধান করে জানা যায় একটি বিড়াল লাফিয়ে পড়েছে মাত্র। তাই বলা হয়েছেঃ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ অর্থাৎ, যে কোন শব্দকে এরা শত্রুর শব্দ বলে মনে করে।

সুতরাং ঘুষের লেনদেন পরিহার করে অন্তর থেকে ভীতি দূর করুন, সাহসী হোন। তারপর দেখুন, আলেম সমাজ আপনার বাহাদুরি দেখতে তৈরি কিনা।

অশ্লীলতার দরুন নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয় আর যাকাত অনাদায়ে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ خَمْسُ خِصَالٍ اِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَاَعُوْذُ بِاللهِ اَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِىْ قَوْمٍ قَطُّ حَتّٰى يُعْلِنُوْا بِهَا اِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْاَوْجَاعُ الَّتِىْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِىْ اَسْلَافِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلَّا اُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَ شِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِهِمْ اِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا وَلَمْ يَنْقُضُوْا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ

رَسُــوْلِهٖ اِلَّا سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْــرِهِمْ فَاَخَــذُوْا بَعْضَ مَافِىْ اَيْــدِيْهِمْ وَمَــالَمْ تَحْكُمْ اَئِمَّتُهُمْ بِكِتَــابِ اللّٰهِ تَعَــالٰى وَيَتَخَيَّــرُوْا فِيْمَــا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ — رواه ابن ماجة

(৪) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মুহাজেরগণ! আল্লাহ্ না করুন, পাঁচটি বিষয়ে যখন তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়বে। (তাহলে এ পাঁচটি বিষয়ের পরিণতিতে অবশ্যই পাঁচটি বিষয় প্রকাশ পাবে। তারপর তিনি সেগুলো বিস্তারিত বললেন।) যখন কোন জাতি-সম্প্রদায়ের মাঝে খোলাখুলি অশ্লীল কাজ হতে শুরু করে, তখন অবশ্যই তাদের মাঝে প্লেগ এবং এমন সব রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে, যা তাদের বাপ দাদাদের মধ্যে কারও হয় নি। আর যে সম্প্রদায় মাপে এবং ওজনে কম দিতে শুরু করবে, তাদেরকে দুর্ভিক্ষ, কঠোর পরিশ্রম ও শাসনকর্তার অত্যাচার-উৎপীড়নের দ্বারা পাকড়াও করা হবে। আর যারা নিজের ধন-সম্পদের যাকাত বন্ধ করে দেবে, তাদের জন্য বৃষ্টি বন্ধ করে রাখা হবে। (এমন কি গরু, ঘোড়া প্রভৃতি গবাদি পশু না থাকলে আদৌ বৃষ্টি হবে না।) আর যে জাতি আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, আল্লাহ্ তাদের উপর অন্য জাতির মধ্য থেকে শত্রু চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদের অধিকারভুক্ত বস্তু-সামগ্রী দখল করে নেবে। আর যে জাতির ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের বিপরীত ফয়সালা দেবে এবং তাঁর হুকুম-আহকামে নিজেদের অধিকার ও পছন্দাপছন্দ প্রবর্তন করবে, তখন এরা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। (ইবনে মাজাহ্)

এ হাদীসে যেসব পাপ ও বিপদ এবং সেগুলোর বিশেষ পরিণতির কথা বলা হয়েছে, সেগুলো নিজের পরিণতিসহ এ পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষদের মাঝে রয়েছে।

সর্বপ্রথম যে বিষয়টি মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, তাহল এই যে, "যে জাতি-সম্প্রদায়ে (তথা সমাজে) প্রকাশ্যে অশ্লীল কর্ম সম্পাদিত হতে থাকবে, তাদের মাঝে অবশ্যই প্লেগ বিস্তার লাভ করবে এবং এমন ধরনের রোগ-ব্যাধি ব্যাপকভাবে প্রকাশ পাবে, যা তাদের বাপ দাদাদের মাঝেও কখনও হয় নি।"

ইদানীং অশ্লীলতা কতখানি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে; সড়ক, পার্ক, ক্লাব, তথাকথিত জাতীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, ওরস, মেলা, হোটেল রেস্তোঁরা এবং নিমন্ত্রণ পার্টিতে কী পরিমাণ অশ্লীল কাজকর্ম অহরহ হতে থাকে তা বলার

অপেক্ষা রাখে না। কারণ, যারা সরাসরি জানেন এবং পত্র পত্রিকা পাঠ করেন, তারা সবাই ভাল করেই জানেন। এসব অশ্লীলতার ফলেই মহামারী আকারে প্লেগ, কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি এবং এমন সব ব্যাধি দেখা যায়, যেগুলোর প্রাকৃতিক কারণ এবং চিকিৎসা জানতে স্বয়ং ডাক্তাররাও অক্ষম। (এক্ষেত্রে সম্প্রতি মানবজাতির প্রতি মৃত্যু ও ধ্বংসের করাল থাবা বিস্তার করে এগিয়ে আসা মরণব্যাধি এইড্স-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। —অনুবাদক) চিকিৎসা বিজ্ঞান যতই উন্নতি করছে, সে পরিমাণেই নতুন নতুন রোগ ব্যাধি প্রকাশ পাচ্ছে। এসব রোগ-ব্যাধির উদ্ভবের যে কারণ বিশ্ব স্রষ্টার রাসূল (দঃ) বলেছেন অর্থাৎ, অশ্লীলতার বিস্তার—যতক্ষণ না তার অবসান হচ্ছে, নতুন নতুন রোগ বালাইর আত্মপ্রকাশও বন্ধ হবে না।

অশ্লীলতা শেষ হবেই বা কেমন করে যখন নাকি অশ্লীলতার ট্রেনিং স্কুল-কলেজ, সিনেমা, থিয়েটার এবং উলঙ্গতাকে জীবনের বড় অঙ্গ বানিয়ে নেয়া হয়েছে, নাচ-নৃত্য, গান-বাদ্য আর নগ্নতা হয়েছে ফ্যাশন ও সংস্কৃতি। সর্বোপরি পূর্বে এসব কর্মকে পাপ বিবেচনা করেই করা হত; কিন্তু এযুগের পাশ্চাত্যপন্থীরা নাচ-গান এবং নগ্নতা ও পর্দাহীনতাকে ইসলামী কাজ বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে মনগড়া হাদীস, সনদহীন বর্ণনা ও গল্প কাহিনীর আশ্রয় নিচ্ছে কিংবা কোরআনের আয়াত ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে মুসলিম উম্মাহ্কে প্ররোচিত করছে।

فَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ

অর্থাৎ, যারা অন্যায়-অনাচার চালিয়ে যাচ্ছে শীঘ্রই তারা জানতে পারবে চাকা কোন দিকে ঘুরছে।

দ্বিতীয়তঃ মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে জাতি ওজন বা মাপে কম দিতে শুরু করবে দুর্ভিক্ষ, কঠিন পরিশ্রম এবং রাজা-বাদশাহ্ (শাসক)-দের অত্যাচার-উৎপীড়নের মাধ্যমে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে।" ওজনে কমতি করা অর্থাৎ, খরিদ্দারকে কম মেপে দেয়া কবীরা গুনাহ (মহাপাপ)। দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। কোরআনে বলা হয়েছেঃ

وَيْــلٌ لِّلْمُـطَفِّفِيْنَ ۝ لا الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَـالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝ وَاِذَا كَالُوْهُــمْ اَوْوَّزَنُــوْهُــمْ يُخْــسِــرُوْنَ ۝ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِــكَ اَنَّــهُــمْ

مَّبْعُوْثُوْنَ ○ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ○ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ مطففين أيت ١-٦

অর্থাৎ, সর্বনাশ রয়েছে মাপে কম দাতাদের জন্য। কারণ, তারা যখন মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয়, তখন পুরোপুরি বুঝে নেয়। পক্ষান্তরে যখন মানুষকে ওজন করে কিংবা মেপে দেয়, তখন কম দেয়। এরা কি ধারণা করে না যে, এদেরকে এক মহা দিবসে উত্থিত করা হবে, যেদিন মানুষ বিশ্বের পালনকর্তার দরবারে উপস্থিত হবে? (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, আয়াত ১—৬)

প্রায়শ বিভিন্ন দেশ, রাষ্ট্র, প্রদেশ ও অঞ্চলে যে দুর্ভিক্ষ ও আকাল দেখা দিতে থাকে, যাতে করে সরকার ও জনসাধারণ উদ্বেগের সম্মুখীন হয়—অন্যান্য পাপ যেমন তার কারণ তেমনি মাপে কম দেওয়াও তার একটি কারণ। খাবার দাবারের বস্তু-সামগ্রী যখন কম পাওয়া যায়, তখন জীবিকা অর্জনের জন্য কঠিন পরিশ্রমও করতে হয়। হাদীসে তারই উল্লেখ রয়েছে। বর্তমান যুগের সরকারসমূহ বিদেশ থেকে গম ও চাল আমদানী করে কিংবা সন্তান জন্মের হার হ্রাস করার আন্দোলন চালিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে জীবিকার ঘাটতি পূরণের চেষ্টা চালায়। দায়িত্বশীলদের ধারণা, এসব পন্থা অবলম্বন করলেই খাদ্য-শস্যের প্রাচুর্য দেখা দেবে। পক্ষান্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনে বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারী অবলম্বন করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি হবে না। জাহেলিয়াত আমলে আরবের লোকেরা এভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলত যে, ওরা খাবে কোত্থেকে? কোরআনে বলা হয়েছেঃ

وَلَاتَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا ○ بنى اسرائيل أيت ٣١

অর্থাৎ, আর দারিদ্র্যের ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রিযিক (জীবিকা) দান করে থাকি। নিঃসন্দেহে তাদের হত্যা মহাপাপ। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩১)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, তোমাদেরকে ও তোমাদের সন্তান-দেরকে আমি রিযিক দান করব। অথচ খোদা বিস্মৃত মানুষ নিজেদেরকেই মনে করে রিযিকের যিম্মাদার। আরবের মূর্খরা সন্তান জন্মের পর খাওয়াবার ভয়ে তাদেরকে হত্যা করে ফেলত আর বর্তমান যুগের লোকেরা খাওয়ানোর ভয়ে

বংশবৃদ্ধি না করার পক্ষ অবলম্বন করেছে। শুধু ব্যবস্থার পার্থক্য; কিন্তু লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

সমস্ত উপায় অপেক্ষা বড় কার্যকর উপায় হল সাধারণ অসাধারণ সবাই মিলে ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার প্রশিক্ষণ নেয়া, সৎকর্ম অবলম্বন করা। মানুষের হক দাবিয়ে রাখা, পয়সা হজম করা এবং ওজনে কম দেয়ার ন্যায় দুষ্কর্মগুলো পরিহার করা। অন্যথায় জীবিকার স্বল্পতা, ক্রমাগত আকাল, প্রাণান্তকর পরিশ্রম এবং বিভিন্ন শাসকের মনো-দৈহিক ও আর্থিক অত্যাচারের যাতাকলে পিষ্ট হতেই থাকবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজনকারকদের উদ্দেশ করে বললেনঃ

اِنَّكُمْ قَدْ وَلَّيْتُمْ اَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيْهِمَا الْاُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ — رواه الترمذى

অর্থাৎ, দু'টি বিষয় তোমাদের হাতে সমর্পণ করা হয়েছে, তা হল মাপ ও ওজন। এ দু'টি বিষয়ের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। (তিরমিযী)

মহানবী (দঃ) তৃতীয় যে বিষয়টি বলেছেন, তাহল এই যে, "যেসব লোক যাকাত বন্ধ করে দেবে, তাদের জন্য বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হবে। চতুষ্পদ জীব-জন্তু না থাকলে আদৌ বৃষ্টি হবে না।" এতে প্রতীয়মান হয়, যাকাত আদায় না করাও বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং আকাল ও দুর্ভিক্ষ পড়ার কারণ। বস্তুত বিত্তবানরা কি পরিমাণ যাকাত বন্ধ করে রেখেছে, তা নিজ নিজ এলাকার প্রত্যেকটি সতর্ক লোকই অনুমান করতে পারেন। যাকাত আদায় না করার মহা অপরাধ ও মহাপাপের পরিণতিস্বরূপ পুরোপুরিভাবে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়াই ছিল পরিস্থিতির দাবী। কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাঁর অসহায় সৃষ্টি তথা প্রাণীকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের জন্য কিছু না কিছু বৃষ্টি পাঠিয়ে দেন। তাতে করে মানুষও যৎসামান্য জীবিকা পেয়ে যায়। কিন্তু কতই না লজ্জাষ্কর বিষয় যে, (আজকের) মানুষ নিজেরা সে যোগ্য রয় নি যাতে রহমতের বৃষ্টির অধিকারী হতে পারে; বরং চতুষ্পদ জীব-জন্তুর কল্যাণে তাদের ভাগ্যে পানি জুটছে এবং চাষবাসের সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, শুধু বৃষ্টি হয়ে গেলেই উৎপাদন হওয়া অপরিহার্য নয়। অতিরিক্ত বৃষ্টিতে অনেক সময় ফসল ধ্বংসও হয়ে যায়। আবার কখনও ফসল প্রচুর হলে তাতে বে-বরকতীও এসে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্ক ঠিক থাকলে এবং প্রাপ্য হক ও ফরযসমূহ সঠিকভাবে আদায় করার প্রতি লক্ষ্য থাকলে সব সময়ই কল্যাণবাহী বৃষ্টি হবে এবং তার মাধ্যমে যে উৎপাদন হবে তাতে বরকত থাকবে।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেনঃ

اِقَامَةِ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللهِ خَيْرٌ مِّنْ مَّطَرٍ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِىْ بِلَادِ اللهِ — رواه ابن ماجة

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র এ ভূপৃষ্ঠের শহরগুলোতে চল্লিশ রাত বৃষ্টি হওয়ার চেয়ে আল্লাহ্‌র একটি হদ (দণ্ডবিধি) প্রতিষ্ঠা করা উত্তম। (ইবনে মাজাহ্)

অর্থাৎ, চল্লিশ রাতের বৃষ্টিতে সে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য আসবে না, যা একটি হদ (দণ্ডবিধি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্জিত হবে।

তাছাড়া অন্য এক হাদীসে মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

لَيْسَتِ السُّنَّةُ بِاَنْ لَّاتَمْطُرُوْا وَلٰكِنَّ السُّنَّةَ اَنْ تَمْطُرُوْا وَتَمْطُرُوْا وَلَا تُنْبِتُ الْاَرْضُ شَيْئًا — رواه مسلم

অর্থাৎ, বৃষ্টি না হওয়াই আকাল নয়; বরং আকাল হল বৃষ্টির পর বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ভূমিতে কোন কিছু উৎপাদিত না হওয়া। (মুসলিম)

বৃষ্টি আসতে দেখে হুযূর (দঃ) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এভাবে নিবেদন করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَّافِعًا

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্! আমাদেরকে কল্যাণকর বৃষ্টি দান কর।" অর্থাৎ, শুধুমাত্র বৃষ্টির দো'আর স্থলে কল্যাণকর বৃষ্টির দো'আ করতেন [মহানবী (দঃ)]। তার কারণ, বৃষ্টিতে অনেক সময় ক্ষতিও হয়ে থাকে। যেমন, প্লাবন এসে যায় অথবা ভূমিধস জাতীয় কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

বর্তমান যুগের বুদ্ধিজীবীরা উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বহু রকম ব্যবস্থা চিন্তা করেন; কিন্তু তারই সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতারও আমন্ত্রণ জানান এবং যাকাতদাতা ও যাকাত দানে উৎসাহদাতাদেরকে মধ্যযুগীয় মোল্লা বলে ভর্ৎসনা করার মাধ্যমে যাকাতের গুরুত্ব ও মহত্ত্বকেও খর্ব করে থাকেন। তারপরেও জীবিকার প্রাচুর্য কেমন করে হবে এবং কেমন করেই বা রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হবে?

চতুর্থতঃ উপরোল্লিখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, "যে জাতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে কৃত অঙ্গীকার লংঘন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর অপর জাতির লোকদের মধ্য থেকে শত্রু চাপিয়ে দেবেন, যে তাদের অধিকারভুক্ত বিষয়-সম্পত্তি কবজা করে নেবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতাও আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে আমরা কি ওয়াদা

করেছি, তা সবারই জানা। অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ্‌কে পালনকর্তা, অন্নদাতা, অভাব মোচনকারী, দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক এবং নিজেদের উপাস্য হিসাবে মান্য করব বলে ওয়াদা করেছিলাম। আর তাঁর হাবীব, ফখরে আলম হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত পথে চলব বলে অঙ্গীকার করেছিলাম। এ ওয়াদা-অঙ্গীকারের দাবী অনুযায়ী আমরা যতক্ষণ চলেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের উপর আমরা ছিলাম প্রবল। বিজয় আমাদের পদচুম্বন করত এবং শত্রু হত পরাভূত। আমরা যেদিকে যেতাম সম্মান ও মর্যাদার সাথে থাকতাম; কিন্তু যখন আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে কৃত অঙ্গীকার লংঘন করেছি, তখনই আমাদের বিজিত রাষ্ট্রগুলো আমাদের হাতছাড়া হতে শুরু করেছে এবং আমরা পরাজিত হয়ে চলেছি। শত্রুর দাসে পরিণত হয়েছি, যারা আমাদের মাঝে গণহত্যা চালিয়েছে, আমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেছে এবং সেসব কিছুই করেছে যা কল্পনারও অতীত ছিল।

পঞ্চমতঃ মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যারা আল্লাহ্‌র কিতাবের (কোরআনের) পরিপন্থী হুকুম (অধ্যাদেশ) জারী করবে, তারা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে।" এ বক্তব্যের দৃষ্টান্তও আমাদের সামনে রয়েছে। আজকের পৃথিবীতে অমুসলিম সরকার তো পরের কথা, মুসলমান শাসক ও কর্মকর্তারা অন্যায় অধ্যাদেশ জারী করে এবং অন্যায় সিদ্ধান্ত দান করে। আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী কাজ করা তাঁর বিধানের অনুবর্তিতা এবং ইসলামের ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থায় চলাকে সেকেলেপনা ও মধ্যযুগীয় বলে আখ্যায়িত করে।

সাম্প্রতিক মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অবস্থা আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। এরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে পেছনে ফেলে রেখে (তথাকথিত) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়, তাই অবশ্যম্ভাবীরূপেই এরা পারস্পরিক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। আমাদের মন্ত্রী-সভাগুলো বিরোধী দলের টানাপোড়েনের দরুন ভাঙ্গতে থাকে। মুসলিম শাসক ও মন্ত্রীদের হত্যা পর্যন্ত সংঘটিত হতে থাকে। আর পারস্পরিক এসব গৃহযুদ্ধের সর্বাধিক দুঃখজনক দিক হল এই যে, অনেক সময় দু'টি মুসলিম রাষ্ট্রের মাঝে এমনি গরমিল দেখা দেয়, যাতে অমুসলিম দেশের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব জোরদার করাকে নিজের প্রতিপক্ষীয় মুসলিম দেশের তুলনায় অগ্রাধিকার দেয়া হয়। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!)

হাদীসে আধুনিক যুগের 'প্রগতিশীল' মুজতাহেদীন (শরীঅতের আলোকে যুগের সমস্যার সমাধান উদ্ভাবক)-দের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, এরা আল্লাহ্‌র কিতাবের খেলাফ সিদ্ধান্ত দেবে এবং আল্লাহ্‌র আইনে নিজেদের অধিকার চালাবে।

ইদানীং কালের অর্ধ আরবী জানা লোকেরা কোরআনের বিধি-বিধানে বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধনের পেছনে লেগে রয়েছে। কেউ কোরবানীকে সম্পদের অপচয় বলে একে শেষ করে দেয়ার পরামর্শ দিচ্ছে আর কেউ সুদের বৈধতা সম্পর্কে পুস্তক প্রকাশ করছে। কারও মাথায় চেপে রয়েছে বহু বিবাহের বৈধতাকে রহিত করার ভূত, আবার কেউ সফরের সময় নামাযের নিয়মানুবর্তিতাকে কষ্ট ও জটিলতার ফ্রেমে আঁটার প্রয়াস চালাচ্ছে ইত্যাদি।

এরা ইসলামকেও পাদ্রী পণ্ডিতদের ধর্মে পরিণত করতে চায়—ওরা যেমন নিজেদের ধর্মে হ্রাস-বৃদ্ধি ও কাটছাট করে—তেমনি এরা ইসলামেও যেন সে অধিকার ভোগ করতে চায়। (নাঊযুবিল্লাহ্)

সংসারপ্রীতি অন্তরকে দুর্বল করে দেয়

وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعٰى كَمَا تُدَاعَى الْاَكَلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَّمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَّلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

— رواه ابو داؤد والبيهقى فى دلائل النبوة

(৫) হযরত সওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন এক যুগ আসবে, যখন কাফের ও বাতিলপন্থীদের দলবল পরস্পর মিলেমিশে তোমাদেরকে বিনাশ করার জন্য এমনভাবে সমবেত হবে, যেমন করে বুভুক্ষুর দল সম্মিলিত হয় খাবার পাত্রের

আশপাশে। (একথা শুনে) এক সাহাবী নিবেদন করলেন, তাহলে কি সেদিন আমরা (সংখ্যায়) কম থাকব? তিনি বললেন, না; বরং সেদিন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে, কিন্তু সে সমস্ত খরকুটোর মত থাকবে, যেগুলোকে পানি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সে সময় আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভীতি দূর করে দেবেন এবং তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা আরোপ করে দেবেন। এক ব্যক্তি নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ দুর্বলতার কারণ কি হবে? তিনি বললেন, তোমরা দুনিয়াকে ভালবাসতে শুরু করবে এবং মৃত্যু থেকে ঘাবড়াতে থাকবে।

(আবু দাউদ প্রভৃতি)

জ্ঞাতব্যঃ সুদীর্ঘ কাল থেকে মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মুসলমানরা নিজেদের সে দুরবস্থা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করছে। কোন জাতি তাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখছে না; পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্বই সহ্য করতে পারছে না। এমনও এক সময় ছিল যখন অন্যান্য জাতি-সম্প্রদায় মুসলমানদেরকে নিজেদের শাসক হিসাবে দেখতে চাইত, আরেক যুগ হল এ যুগ, যাতে মুসলমানদেরকে নিজেদের শাসনের আওতায় রাখাও পছন্দ করে না। সারা পৃথিবীর মুসলমান একই সময়ে হঠাৎ করে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাতো কখনোই সম্ভব হবে না, যেমন এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী কোন কোন হাদীসে রয়েছে। তবে এমন ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেছে যে, স্বয়ং মুসলমানরা যেখানে শাসনকর্তা ছিল, বিপ্লবের পর তারা সেখান থেকে প্রাণ পর্যন্ত বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। স্পেনই এর জলজ্যান্ত ও বিখ্যাত দৃষ্টান্ত।

কেন আজ মুসলমানদেরকে এমন অপমান ও নিগ্রহের মুখ দেখতে হচ্ছে? সংখ্যায় কোটি কোটি হওয়া সত্ত্বেও কেন তাদেরকে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে? এর উত্তর স্বয়ং বিশ্ব দিশারী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর ভাষ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। তাহল এই যে, দুনিয়ার মহব্বত (সংসারপ্রীতি) ও মৃত্যুভীতির কারণেই এ অবস্থা।

মুসলমানরা যে সময় দুনিয়াকে প্রিয় জ্ঞান করত না এবং জান্নাতের তুলনায় (যা মৃত্যু ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়) পার্থিব জীবন তাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ ছিল, তখন সংখ্যায় অল্প থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জাতি-সম্প্রদায়ের উপর তারা প্রবল ছিল এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদ করে অন্যদের অন্তরে পর্যন্ত রাজত্ব করত।

আমাদের আজকের যে অবস্থা, তাকে আমরা নিজেরাই পাল্টাতে পারি, তবে শর্ত হল, পূর্ববর্তী মুসলমানদের মত দুনিয়াকে নিকৃষ্ট এবং মৃত্যুকে প্রাণাধিক প্রিয়

মনে করতে হবে। অন্যথায় অপমান শুধু বাড়তেই থাকবে। অতএব, "হে বুদ্ধিমানগণ, শিক্ষা গ্রহণ কর।"

আল্লাহ্ আজও পর্যন্ত সে জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন নি,
নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যাদের মাঝে নেই।

অত্যাচার ও কার্পণ্যের পরিণতি

وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِى الظَّالِمَ حَتّٰى اِذَا اَخَذَهٗ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ — متفق عليه

(৬) হযরত আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা জালেমদেরকে অবকাশ দিতে থাকেন, কিন্তু যখন তাদেরকে পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। তারপর তিনি (নিজের বক্তব্যের সমর্থনে) এ আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ط اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ○ هود آيت ١٠٢

অর্থাৎ, তোমার পালনকর্তার পাকড়াও এমনই (কঠিন যে,) যখন তিনি অত্যাচারে লিপ্ত জনপদসমূহকে পাকড়াও করেন, তখন অবশ্যই তার পাকড়াও হয় অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও কঠোর। (সূরা হুদ, আয়াত ১০২) [বুখারী ও মুসলিম]

এক হাদীসে আছে, একবার কোন এক লোক বলল, অত্যাচারীর অত্যাচার শুধু তাকেই বিপদগ্রস্ত করে। একথা শুনে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন, না, তা নয়; বরং অত্যাচারীর অত্যাচারে সবাই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমন কি পাখি পর্যন্ত নিজের বাসায় অত্যাচারীর অত্যাচারে শুকিয়ে মরে যায়। (মেশকাত) অর্থাৎ, একথা বলা ঠিক নয় যে, অত্যাচারের প্রভাব শুধু অত্যাচারী পর্যন্তই পৌঁছায়; বরং মানুষ তো মানুষ পশু-পাখিরা পর্যন্ত এতে বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ — رواه مسلم

(৭) হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা অত্যাচার থেকে বেঁচে থাক। কারণ, অত্যাচার কেয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে উপস্থিত হবে। আর তোমরা কার্পণ্য থেকেও বাঁচ। কারণ, কার্পণ্য তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করে ছেড়েছে; তাদেরকে অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটাতে প্ররোচিত করেছে এবং হারাম সামগ্রীকে তারা (কার্যত) হালাল বানিয়ে নিয়েছে। (মুসলিম)

এ হাদীসে জুলুম (অত্যাচার) ও কৃপণতা পরিহার করার তাকিদ দেয়া হয়েছে। এ দু'টি বিষয় জাতি, দল ও পরিবারকে ধ্বংসাত্মক বিপদাপদের কবলে নিপতিত করে বিনাশ করে ছাড়ে। ইদানীং কালে জুলুম ও কঞ্জুসী (অত্যাচার ও কার্পণ্য)-এর ব্যাধি চরম আকারে মানুষের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় না করাই হল কার্পণ্য ও কঞ্জুসী। অর্থপ্রীতি ও সম্পদলিপ্সায় আজ অন্তর আচ্ছন্ন। ফলে হারাম ব্যবসা-বাণিজ্য পরিহার করা হয় না। পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করার জন্য মন উদ্বুদ্ধ হয় না। অন্যের অধিকার গ্রাস করার পন্থা ও ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হয়। পরিণতিতে বড় বড় পাপাচারের আশ্রয় নেয়া হয়, যার বিপদ মানুষকে ভোগ করতে হয়।

জুলুম হল মহাপাপ, যার পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাতে নিতান্তই ভয়াবহ। বিগত ৬ষ্ঠ হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, অত্যাচারীকে যথাশীঘ্র পাকড়াও করা না হলেও অত্যাচারী নিজে, তার পরিবার-পরিজন ও গোত্র-গোষ্ঠী যেন এ ধারণা না করে যে, তাকে পাকড়াও করাই হবে না কিংবা সে অনায়াসে জীবন অতিবাহিত করতে থাকবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র এই আপাত শিথিলতা দেখে কোন অত্যাচারী যেন প্রবঞ্চিত না হয়। আকস্মিকভাবে যখন তাকে পাকড়াও করা হবে, তখন তা হবে অত্যন্ত কঠিন। আখেরাতে এ অত্যাচার অন্ধকার হয়ে সামনে আসবে। অত্যাচারের অন্ধকার অত্যাচারীকে আলোর অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে দেবে না এবং মুক্তির কোন পথও সে খুঁজে পাবে না।

ইতিহাসের পাতা এবং বর্ষীয়ান লোকের স্মৃতি এ বিষয়ের সাক্ষ্য বহন করে যে, যখনই কোন সরকার কিংবা কোন জাতি-সম্প্রদায় অথবা কোন ব্যক্তি অত্যাচারের পথ অবলম্বন করেছে, তখন তার পরিণতি মন্দই হয়েছে। পবিত্র শরীঅতে যেমন অত্যাচার হারাম তেমনি অত্যাচারীকে সাহায্য করাও হারাম। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন,

مَنْ مَّشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيَقْوِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهٗ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلَامِ
— مشكوة باب الظلم

অর্থাৎ, যে লোক কোন অত্যাচারীর সাথে চলে, তাকে শক্তি যোগানোর উদ্দেশে; অথচ সে জানে, লোকটি অত্যাচারী, তাহলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে গেল। (মেশকাত)

অত্যাচারীর সাহায্যকারী সম্পর্কেই যখন বলা হয়েছে যে, ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না, তখন ইসলামের সাথে স্বয়ং অত্যাচারীদের কতটা সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকতে পারে? (সে কথা সহজেই অনুমেয়।) অত্যাচারী শাসকবর্গ, জমিদার ও বিত্তবানদের পারিষদ, পেয়াদা, করণিক ও অন্যান্য কর্মচারী যারা অত্যাচারীর সাহায্য করে, তাদের সবারই এ হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করা উচিত।

মযলূম অর্থাৎ, অত্যাচারিতের বদ দো'আ থেকে কঠোরভাবে আত্মরক্ষা করাও নিতান্ত জরুরী। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন,

اِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّمَا لَيَسْأَلُ اللهَ تَعَالٰى حَقَّهٗ وَاِنَّ اللهَ
لَايَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهٗ — بيهقى فى شعب الايمان

অর্থাৎ, অত্যাচারিতের বদ দো'আ থেকে বাঁচ। কারণ, (তাদের বদ দো'আ অবশ্যই লাগবে। তার কারণ,) সে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তার হক (বা অধিকার) প্রার্থনা করে। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা হকদারের হক আটকে রাখেন না। (শোআবুল ঈমানে বায়হাকী)

অন্য আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন,

اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ — بخارى و مسلم

অর্থাৎ, অত্যাচারিতের বদ দো'আ থেকে বাঁচ। কারণ, এর এবং আল্লাহ্ তা'আলার মাঝে কোন অন্তরায় নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

মহানবী (দঃ) আরও এরশাদ করেছেন যে, অত্যাচারিতের ফরিয়াদকে আল্লাহ্ তা'আলা মেঘমালার উপর তুলে নেন, তার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়

এবং পরওয়ারদেগারে আলম বলেন, কসম আমার ইয্যতের, অবশ্য অবশ্যই আমি তোমার সহায়তা করব, তা এক যুগ পরে হলেও। (তিরমিযী)

অনেক ব্যক্তি ও পরিবার আজ এ কারণেও বিপদাপদের সম্মুখীন যে, অত্যাচারিতের আর্তনাদ তাদেরকে তছনছ করে দিয়েছে। অত্যাচারীরা অসহায় দুর্বলদেরকে কষ্ট দিয়ে এবং তাদের অধিকার হরণ করে সামান্য কিছুদিন আরামে কাটায়। তারপর যখন অত্যাচারিতদের আর্তনাদ সক্রিয় হয়ে উঠে, তখন তাদের সমস্ত আরাম-আয়েশ, ইয্যত-সম্মান, যশ-খ্যাতি ও ধনসম্পদ মাটিতে মিশে যায় এবং তখন তারা একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। তাই কবি বলেনঃ

بترس از آه مظلوماں که هنگام دعا کردن
اجابت از درحق بهر استقبال می آید

অর্থাৎ, মযলূমের আর্ত-ফরিয়াদকে ভয় কর। কারণ, মযলূমের দো'আ তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক তার কোন (মুসলমান) ভাই-এর প্রতি কোন অত্যাচার করে বসেছে অর্থাৎ, কাউকে বেইয্যতি করেছে কিংবা কারও কোন হক আত্মসাৎ করে ফেলেছে, তার উচিত (আজই তার সে হক আদায় করে দেয়া কিংবা ক্ষমা চেয়ে নেয়া,) সেদিনের পূর্বে তা হালাল বা বৈধ করিয়ে নেয়া যেদিন না দীনার থাকবে, না দেরহাম (প্রভৃতি অর্থকড়ি)। (অতঃপর তিনি আরও বলেছেন যে,) অন্যথায় তার কোন সৎকর্ম থাকলে অত্যাচারের পরিমাণে তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয়া হবে। আর তার কোন সৎকর্ম না থাকলে অত্যাচারিতের মন্দ কর্ম নিয়ে অত্যাচারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী)

একবার হুযূর (দঃ) সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশে বললেন, তোমরা কি জান, দরিদ্র কে? সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, আমরা তো তাকেই দরিদ্র বলে মনে করি, যার কাছে অর্থ-সম্পদ নেই। একথা শুনে মহানবী (দঃ) বললেন, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের (প্রকৃত) দরিদ্র সে ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে আসবে (অর্থাৎ, সে লোকটি নামাযও পড়েছে, রোযাও রেখেছে এবং যাকাতও দিয়েছে,) অথচ (এসব কিছু সম্পাদন করা সত্ত্বেও) এমন অবস্থায় (হাশরের মাঠে) উপস্থিত হবে যে, হয়তো (দুনিয়াতে) কাউকে সে গালি দিয়েছিল, কারও প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিল কিংবা (অন্যায়ভাবে) কারও সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে হত্যা করেছিল, কাউকে মারধর করেছিল।

(আর যেহেতু কিয়ামতের দিনটি হল বিচার-মীমাংসার দিন) তাই (সে লোকটির বিচার এভাবে করা হবে যে, সে যাদেরকে উৎপীড়ন করেছিল এবং যাদের অধিকার হরণ করেছিল, তাদের সবাইকে তার সৎকর্মগুলো ভাগ করে দিয়ে দেয়া হবে।) কিছু দেয়া হবে এ পাওনাদারকে, কিছু দেয়া হবে সে পাওনাদারকে। তারপরেও পাওনা পূরণ হওয়ার পূর্বেই যদি তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে পাওনাদারদের পাপ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাকে দোযখে পাঠিয়ে দেয়া হবে। (মুসলিম)

এ হাদীসে বলা হয়েছে, শুধু টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করাই অত্যাচার নয়; বরং গালি দেয়া, অপবাদ আরোপ করা, অহেতুক মারধর করা, অপমান-অপদস্ত করা প্রভৃতিও অধিকার হরণ। অনেকে নিজেদেরকে ধার্মিক লোক বলে মনে করে; কিন্তু এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকে না।

মনে রাখা উচিত, আল্লাহ্ তওবা-অনুশোচনার দ্বারা নিজের হক মাফ করে দেন; কিন্তু বান্দাদের হক তখনই ক্ষমা হতে পারে, যখন তা সংশ্লিষ্ট বান্দাকে পরিশোধ করে দেবে কিংবা ক্ষমা করিয়ে নেবে।

ক্রমাগত আযাব আগমনের যুগ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَـالٰى عَنْـهُ قَالَ قَالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَـالٰى عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اِذَا اتُّخِـذَ الْفَيْئُ دِوَلًا وَالْاَمَـانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكٰـوةُ مَغْـرَمًـا وَتُعُلِّمَ لِغَيْـرِ الدِّيْنِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهٗ وَعَقَّ اُمَّهٗ وَاَدْنٰى صَدِيْقَـهٗ وَاَقْصٰى اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَـانَ زَعِيْمُ الْقَـوْمِ اَرْذَلَهُمْ وَاُكْـرِمَ الرَّجُـلُ مَخَـافَةَ شَرِّهٖ وَظَهَـرَتِ الْقَيْنَـاتُ وَالْمَعَـازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَ لَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّـةِ اَوَّلَهَـا فَارْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَّخَسْفًا وَمَسْخًا وَّقَذْفًا وَاٰيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهٗ فَتَتَابَعَ —— رواه الترمذى

(৮) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, যখন গনীমত সামগ্রীকে (ঘরের) সম্পদ মনে করা হতে থাকবে, আমানত

সামগ্রীকে গনীমত মনে করে আত্মসাৎ করা হবে, যাকাতকে জরিমানা ভাবা হতে থাকবে, দুনিয়া উপার্জনের জন্য (দ্বীনী) শিক্ষা অর্জন করা হবে, যখন মানুষ নিজের স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মাকে উৎপীড়ন করবে, বন্ধুদেরকে কাছে টানবে আর পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদসমূহে শোরগোল শুরু হবে, সম্প্রদায় (গোষ্ঠী) -এর সর্দার হবে অসৎ লোক, জাতির দায়িত্বশীল হয়ে বসবে বেজাত লোক; কোন লোকের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাকে সম্মান করা হবে, গানবাদ্যকর রমণী ও গানবাদ্যের নানান উপকরণ প্রকাশ পাবে। মদ্যপান ব্যাপক হবে এবং এ উম্মতের উত্তরসুরিরা (সৎ) পূর্বসূরিদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে, তখন লোহিত রং ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পের অপেক্ষায় থেকো। ভূমিতে ধসে যাবার, আকৃতি বিকৃত হয়ে পড়ার এবং আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণেরও অপেক্ষা করো। এসব আযাবের সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত লক্ষণেরও অপেক্ষা করতে থেকো, যা ক্রমাগত (একের পর এক) এমনভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে যেমন মালার সুতা ছিঁড়ে গেলে হয়—দানাগুলো একের পর এক পড়ে যেতে থাকে।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত আলী (রাঃ) থেকেও এ হাদীস বর্ণিত রয়েছে এবং তাতে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, (পুরুষরা) রেশমী পোশাক পরতে শুরু করবে।

(মেশকাত, তিরমিযী)

এ হাদীসে যেসব বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সেগুলো ইদানিং প্রকাশিত হয়ে গেছে। এর কোন কোন পরিণতি (অর্থাৎ, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিধস প্রভৃতি)-ও নানা জায়গায় সংঘটিত হচ্ছে। উম্মতের কৃতকর্মের প্রতি যদি লক্ষ্য করা যায় এবং সেসব আযাবগুলোর পর্যালোচনা করা যায় যা ভূমিকম্প প্রভৃতির আকারে (একের পর এক) সংঘটিত হচ্ছে, তাহলে এ হাদীসের প্রেক্ষাপটে এ বাস্তবতার বিষয় পুরোপুরিভাবে বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, যা কিছু বিপদ-বিড়ম্বনা আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি তার সবই আমাদেরই কৃতকর্মের ফল এবং আমাদেরই অপকর্মের পরিণতি।

উল্লিখিত হাদীসটির মূল ভাষাকে পৃথক পৃথকভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে—

اُتُّخِذَ الْفَيْئُ دِوَلًا "গনীমত সামগ্রীকে ঘরের সম্পদ মনে করা হবে।" এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'লুমআত' গ্রন্থ প্রণেতা লিখেছেন ঃ

وَالْمُـرَادُ فِى الْحَـدِيْثِ اَنَّ الْاَغْنِيَاءَ وَاَصْحَابَ الْمَنَاصِبِ يَتَدَاوَلُوْنَ اَمْـوَالَ الْفَيْئِ وَيَمْنَعُـوْنَهَا مِنْ مُّسْتَحِقِّيْهَا وَيَسْتَأْثِرُوْنَ بِحُقُوْقِ الْفُقَرَاءِ

অর্থাৎ, এ বাক্যটির মর্ম এই যে, পুঁজিপতি ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী লোকেরা গনীমত সামগ্রীকে (যা সাধারণ মুসলমান ও দীন-দরিদ্র জনগণের অধিকার) নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে ভোগ করবে এবং প্রাপকদের দেয়ার পরিবর্তে নিজেরাই তা আত্মসাৎ করে বসবে।

'লুমআত' প্রণেতা শেষ বাক্য يَسْتَأْثِرُوْنَ بِحُقُوْقِ الْفُقَرَاءِ (বিত্তবানরা গরীবদের হক আত্মসাৎ করে বসবে) বলে ইঙ্গিত করছেন যে, হাদীসটিতে 'গনীমত' শব্দটি উদাহরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃত মর্মার্থ হল এই যে, পৃথিবীর প্রভাবশালী ও বিত্তবান লোকেরা গরীব দুঃখীর হক আত্মসাৎ করতে থাকবে। যেমন আজকে আমরা ওয়াক্ফ সম্পত্তিগুলোর ব্যাপারে নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। মসজিদের এক শ্রেণীর মুতাওয়াল্লী কিংবা মাদ্রাসার কোন কোন মুহতামিম (পরিচালক) এবং অন্যান্য ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপকরা আসল প্রাপকদেরকে বঞ্চিত করে রাখে এবং খাতাপত্রে ভুল হিসাব লিখে সে অর্থ নিজেরাই আত্মসাৎ করে।

وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا "আর আমানত সামগ্রীকে আত্মসাৎ করা হবে গনীমত সামগ্রী মনে করে।" অর্থাৎ, কেউ যখন কারো কাছে আমানত সামগ্রী রাখবে, তখন তাতে খেয়ানত করতে গিয়ে সামান্যতম সংকোচ বোধ করা হবে না এবং তা একেবারে তেমনিভাবে ব্যয় করা হবে, যেমন নিজের সম্পদ, যুদ্ধলব্ধ হালাল সম্পদ কিংবা পৈত্রিক সম্পত্তি নিঃসংকোচে ব্যয় করা হয়।

وَالزَّكٰوةُ مَغْرَمًا "আর যাকাতকে মনে করা হবে জরিমানা।" অর্থাৎ, যাকাত দেয়া নিজের মনের উপর ভারি ও কষ্টকর হবে। যেমন, অবাঞ্ছিত কোন বিষয়ের জরিমানা দিতে হয় কিংবা বিনা প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করতে হয়। আমাদের এ যুগে যাকাতের ব্যাপারে এমনি হচ্ছে। বিত্তবানদের মধ্যে যাকাতদাতার সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আর দাতাদের মধ্যেও হৃষ্টচিত্তে আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয়কারী খুবই কম।

وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ "আর দ্বীনের শিক্ষা দ্বীন বহির্ভূত বিষয় (অর্থাৎ, দুনিয়া) -এর জন্য অর্জন করা হবে।" ইদানীং মানুষের অবস্থাও এই যে, পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি, সম্পদ-প্রাচুর্য, চাকরী ও ক্ষমতা লাভের উদ্দেশে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করে। এরা সামান্য কিছু (অর্থ) পেলে ওয়াযও করবে, কোরআনও শিক্ষা দেবে, কেরাআতের অনুশীলনও করিয়ে দেবে, ইমামতীও করবে এবং এর দায়িত্ব উপলব্ধি করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মুসাল্লায়ও হাজির থাকবে; কিন্তু চাকুরী চলে গেলে নিতান্ত আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে (নিঃস্বার্থভাবে) এক ঘন্টাও কোরআন-হাদীস পড়ানোর ব্যাপারে তৈরী থাকবে না। আর ইমামতী চলে গেলে নামাযের জমাআতের গুরুত্ব পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে।

وَاَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهٗ وَعَقَّ اُمَّهٗ "আর মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের প্রতি দুর্ব্যবহার করবে।" অর্থাৎ, স্ত্রীর বৈধাবৈধ (ন্যায় অন্যায়) সব রকম আবদার পূরণ করা হবে, আর মায়ের সেবা-যত্নের পরিবর্তে তাকে কষ্ট দেয়া হবে, তার সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে না, তার কথা শুনবে না। বর্তমান যুগটিতে তাই হচ্ছে।

وَاَدْنٰى صَدِيْقَهٗ وَاَقْصٰى اَبَاهُ "নিজের বন্ধু-বান্ধবকে কাছে টানবে আর পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে।" অর্থাৎ, বন্ধু-বান্ধবের মর্যাদা অন্তরে থাকবে; কিন্তু পিতার সেবাযত্ন ও মনঃতুষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। পিতার কথার উপরে থাকবে বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধ ও পরামর্শের মূল্য। হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়তে وَبَرَّ صَدِيْقَهٗ وَجَفَا اَبَاهُ (বন্ধুর সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং পিতার প্রতি অসদাচরণ করবে) কথাটি বলা হয়েছে। যেমন ইদানীং আমরা নিজের চোখেই এমন ঘটনা দেখছি। মানুষ পিতামাতার সেবার ব্যাপারে নিতান্ত গাফেল।

وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ "আর মসজিদগুলোতে হৈচৈ হতে থাকবে।" অর্থাৎ, মসজিদের আদব-সম্মান অন্তর থেকে বিদায় নেবে এবং হৈচৈ, শোরগোল শোনা যাবে। সাধারণত মসজিদগুলোতে ইদানীং মুসলমানদের আচরণ এমনি দেখা যাচ্ছে। মসজিদগুলোতে দলাদলি, ঝগড়া-বিবাদ ও পরনিন্দা করতেও মুসলমানরা দ্বিধা করছে না।

وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلَهُمْ "ফাসেক লোকেরা গোষ্ঠীর সর্দার হবে এবং অসৎ লোকেরা হবে জাতির দায়িত্বশীল ব্যক্তি।" যেমনটি আজকাল দেখা যায়। ধর্মপরায়ণ, পরহেযগার ও সৎ লোকদেরকে গোষ্ঠীর দায়িত্ব দেয়া হয় না; বরং অসৎ লোকদেরকে গোষ্ঠীর সর্দার ও প্রধান গণ্য করা হয়। কোন সভা-সমিতি বা দল গঠিত হলে যদিও তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একান্তভাবে ধর্মীয় ও ইসলামী নির্ধারণ করা হয় এবং তার নামটিও নির্ভেজাল ধর্মীয় রাখা হয়, কিন্তু তথাপি তার সভাপতি; সম্পাদক বা কর্মকর্তা এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়, যার মাঝে ধার্মিকতা, সংযম ও খোদাভীতি, দয়া-করুণা, সততা, বিশ্বস্ততা আমানতদারী প্রভৃতি সদগুণাবলীর নামগন্ধও থাকে না।

وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهٖ "কোন লোকের সম্মান করা হবে তার অনিষ্টের (চক্রান্তের) ভয়ে।" অর্থাৎ, কারও অন্তরে তার কোন রকম শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকবে না; কিন্তু বাহ্যিকভাবে এ কারণে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা রেওয়াজ হয়ে যাবে যে, অমুক ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করা না হলে সে কোন রকম কূটচক্রান্ত করতে পারে এবং নিজের ক্ষমতা ও অর্থকড়ির দাপটে যে কোন ধরনের বিপদে ফেলে দিতে পারে।

বর্তমান যুগে ঠিক তাই হচ্ছে। সামনাসামনি যাদেরকে সম্মান করা হয়, পেছনে তাদের প্রতিই গাল-মন্দের ঝড় উঠে।

وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ "গানবাদ্যকর রমণী এবং গানবাদ্যের নানান যন্ত্রপাতি প্রচলিত হবে।" যেমন ইদানীং আমরা দেখছি। কিছু টাকা পয়সা হাতে আসলে কিংবা ভাল কোন চাকরী-বাকরি পেয়ে গেলে খেলাধুলা ও গানবাজনার সাজ সরঞ্জাম খরিদ করা অপরিহার্য মনে করা হয়। বাড়িতে রেডিও-টেলিভিশনের উপস্থিতি উন্নতির মানদণ্ড ও সম্পন্নতার লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেডিও-টিভি চলছে আর ছোট বড় সবাই মিলেমিশে প্রেমের গজল, অশ্লীল গান, অশালীন হাস্য-কৌতুক শুনছে। বিয়ে-শাদী ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে গানবাদ্যের ব্যবস্থা না থাকলে সে অনুষ্ঠানকে মনে করা হয় শুষ্ক-বিস্বাদ। বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের মাযারে ওরসের নামে সমাবেশ হয় এবং তাতে গানবাদ্যের সরঞ্জাম যোগাড় করে বিনোদনের আয়োজন চলে। নর্তকীর নাচ-গানে মত্ত হয়ে মানুষ নামাযেরও অবসর পায় না। যেসব বুযুর্গের জীবন শরীঅতবিরোধী বিষয়ের মূলোৎপাটনের জন্য নিবেদিত ছিল, তাঁদের সমাধিগুলো খেল-তামাশা ও নাচগানের আড্ডায় পরিণত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, গানবাদ্য অন্তরে কপটতা (মুনাফেকী) সৃষ্টি করে, যেমন, পানি উৎপাদন করে ফসল। (বায়হাকী)

তদুপরি মহানবী (দঃ) বলেছেন, আমার পালনকর্তা আমাকে সমগ্র বিশ্বজাহানের জন্য রহমত ও হেদায়তকারীরূপে পাঠিয়েছেন এবং আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমি গান-বাদ্যোপকরণ, মূর্তি-বিগ্রহ, ক্রুস (যেটিকে খৃষ্টানরা ধর্মীয় প্রতীক মনে করে) এবং জাহেলিয়াত আমলের বিষয়সমূহকে মিটিয়ে দেই।

পক্ষান্তরে ইদানীং গানবাদ্য জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়ে গেছে এবং বৈবাহিক জীবনের মানও এমনভাবে পাল্টে গেছে যে, স্বামী ও স্ত্রী নির্বাচন করার জন্য (এখন আর) দ্বীনদারী ও খোদাভীরুতার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না, বরং পুরুষরা খুঁজে উর্বশী গীতিনৃত্যপটিয়সী রমণী আর স্ত্রীর প্রয়োজন হিরো ধরনের পুরুষ। অর্থকড়ি ও খ্যাতি অর্জন করার নেশায় বহু ভদ্র ঘরের মেয়েরা পারিবারিক মান মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে এপথে চলে আসছে। এজেন্ট ও দালালরা প্রতারিত করে তাদের জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। একজন অভিনেত্রী কোন আচরণ করে বসে যা কক্ষনো করণীয় ছিল না। পোষ্টার কিংবা পত্র-পত্রিকায় যখন তাদের পরিচিতি ছাপা হয় কিংবা তাদের প্রশংসা করা হয়, তখন তাদের মনোপ্রাণ অধিকতর উৎসাহিত বোধ করে। ফলে অশ্লীলতার ধাপগুলো তারা আরও দ্রুত অতিক্রম করতে থাকে। সময়ের চাহিদা দেখে ইদানীং কোন কোন স্কুল কলেজেও নৃত্যগীতের নিয়মিত শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে।

রেডিও ভাল ভাল কথা এবং উত্তম চরিত্রের শিক্ষা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার একটি চমৎকার উপায়; কিন্তু এতে ভাল কথা, ভাল বক্তব্য কালে-ভদ্রে কখনো-সখনো প্রচার করা হয়, পক্ষান্তরে গানবাদ্য চলে সর্বক্ষণ। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান আমলের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও সংস্কারমূলক অনুষ্ঠান পছন্দ করেন না।

মহানবী (দঃ) দুনিয়া থেকে অশ্লীলতার বিনাশ এবং গানবাদ্য ও খেল-তামাশা অপসারিত করে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য এসেছিলেন; কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ইদানীংকালের মুসলমানরা মহানবী (দঃ)-এর একান্ত আলোচনা বা কাওয়ালীর মজলিস বসিয়ে হার্মোনিয়াম, তবলা ও অন্যান্য বাদ্য সামগ্রীর মাধ্যমে তা উপভোগ করে। এসব মজলিস-মাহফিলের উদ্দেশ্য আসলে মহানবী (দঃ)-এর আলোচনা নয়; বরং গানবাদ্যের মাধ্যমে নিজেদের চিত্তবিনোদনই এসবের মূল লক্ষ্য। মহান আল্লাহ্ তা'আলার মহান নবী (দঃ)-এর আলোচনাকে ছুতা করে চিত্তবিনোদন সত্যি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

চলচ্চিত্র নির্মাতারা ধর্মীয় শ্রেণীকে চলচ্চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য, ধর্মীয় প্রতীকগুলোকে চিত্রায়িত করে জনগণের সামনে তুলে ধরতে শুরু করেছে। নিজেদের দাবী অনুযায়ী তারা ইসলামী চলচ্চিত্র নির্মাণ করছে। কিন্তু তাতে গানবাদ্য আর নারী মুখ অবশ্যই দেখা যায়। কোন ছবিতে দো'আ প্রার্থনার দৃশ্য দেখাতে হলে তাতেও সাজানো গোছানো বেপর্দা নারী মুখই বেছে নেয়া হয়। আরব সওদাগর দেখানো হোক কি জাহাঙ্গীরের ন্যায় বিচার, হাতেম তাইর দানশীলতা চিত্রায়িত করা হোক কি তারেকের শৌর্য-বীরত্ব, অবশ্যই তাতেও নারীমুখ দেখানো হবে। নারীকে এমনভাবে বেআবরু করা হচ্ছে যে, ক্যালেণ্ডার, বিজ্ঞাপণ কিংবা ব্যবহার সামগ্রীতে নারী সৌন্দর্যের প্রদর্শনী চলছে। অফিস আদালতে কর্মরত বেপর্দা নারীদের সংখ্যা দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে।

সিনেমা হলে কোন কিছুই ইসলামী হতে পারে না। ইসলাম তো সচ্চরিত্রতা, সদাচরণ ও উত্তম স্বভাব, লজ্জা, সততা ও পবিত্রতার প্রদর্শন কামনা করে।

বলা হয়, মৌলবীদের সেকেলেপনা ও সংকীর্ণতা মুসলমানদের উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। সিনেমার মত লাভজনক বিষয় থেকে বাধা দান করে, অথচ এতে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, যুদ্ধের পটভূমিকার দৃশ্যাবলী সামনে আসে, অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়, উত্থান ও পতনের ঘটনাবলী এবং অতীত রাজন্যবর্গের ন্যায়বিচার, বীরত্ব ও শৌর্যবীর্যের দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করা যায়। তারপরেও মৌলবীরা কেন এহেন বিপুল লাভজনক ও কল্যাণকর উদ্যোগে বাধা দান করে?

আমরা বলি, কোন চলচ্চিত্রের দ্বারা কোন লাভ হয় বলে ধরে নিলেও ছবি দেখা কক্ষনও জায়েয হয়ে যাবে না। কোরআন পাক জুয়া ও মদের আলোচনা প্রসঙ্গে

উল্লেখ করেছে, এগুলোতে যেমন উপকারিতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহাপাপ ; কিন্তু লক্ষণীয় যে, উপকারিতার কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও তার অবলম্বন থেকে বিরত রেখেছে।

বস্তুত যাবতীয় লাভজনক বিষয়ই জায়েয হয় না। লাভের সাথে সাথে তার অগ্র-পশ্চাত সামষ্টিক, ব্যক্তিগত, চারিত্রিক ও ঈমানী কল্যাণকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। তদুপরি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আপনারা যেসব উপকারিতা ও লাভ অর্জন করতে চান, তা কি অন্য কোন মাধ্যমে অর্জন করা যায় না? আমরা তো আজও পর্যন্ত কোন বিজ্ঞজন এবং প্রকৌশলী বিজ্ঞানীর ব্যাপারে একথা শুনি নি যে, তার বুদ্ধিবৃত্তি বা মেধার বিকাশ সিনেমা দেখে দেখে হয়ে গেছে। অথবা কোন প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান সম্পর্কে একথা পড়ি নি যে, সিনেমায় অতীত পরিপ্রেক্ষিত ও ঘটনাবলী দেখে দেখে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য হয়ে উঠেছেন। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় চরিত্র বিনষ্ট হবে, না ভাল হবে? অতীত জাতি সম্প্রদায় ও রাজন্যবর্গের ঘটনাবলী আর জাতি সম্প্রদায়ের উত্থান-পতনের কারণ উপলব্ধি করার জন্য কোরআন-হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ কি কখনও কোরআন-হাদীস বুঝার জন্য কোন সময় বের করেছেন ; কোন পয়সা ব্যয় করে দেখেছেন? কোরআন-হাদীস তো রিপু থেকে সরিয়ে মানুষকে আল্লাহ্‌র সাথে সংযুক্ত করে এবং চরিত্রহীনতা ও নির্লজ্জতা দূর করে! রৈপিক তাড়নাকে স্তিমিত করে পবিত্রতা ও সততার সাথে বসবাস করার নিয়ত থাকলে কোরআন-হাদীস হাতে নিন।

এখানে প্রয়োজন মনে করেই চলচ্চিত্র সম্পর্কে কিছুটা বেশী কথা লিখে ফেলেছি। গানবাদ্যকর রমণী এবং গানবাদ্যের উপকরণ সম্পর্কেও অনিচ্ছাকৃত লেখা দীর্ঘ হয়ে গেছে। তার পরেও পুনরায় বিষয়টি ভেবে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সূরা বাকারার আয়াতের একটি অংশ উদ্ধৃত করে বিষয়টি সমাপ্ত করছি। আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَلَاتَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللهِ هُزُوًا ز وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ط وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○ — بقره أيت ٢٣١

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলীকে উপহাসে পরিণত করো না এবং স্মরণ কর আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতসমূহের কথা যা তোমাদের উপর রয়েছে। (বিশেষকরে সে) কিতাব ও প্রজ্ঞাকে (উপহাসে পরিণত করো না) যা তিনি

তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দান করেন। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক এবং জেনো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে অবগত।* (সূরা বাকারা, আয়াত ২৩১)

وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ "আর যখন মদ্যপান অবাধ হতে শুরু করবে।" এ অংশের বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। সবাই জানেন, বিশ্বের সর্বত্র মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এমন কি, অমুসলিম দেশগুলোর মতো মুসলিম দেশগুলোতেও এর প্রচলন অত্যন্ত ব্যাপক। মদ সম্পর্কে যেসব শাস্তির ভয় ও ভর্ৎসনা বর্ণিত রয়েছে, তার কিছু আলোচনা আমরা ১নং হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে করে এসেছি।

وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا "এ উম্মতের উত্তরসূরিরা পূর্বসূরিদের প্রতি অভিসম্পাত দিতে থাকবে।" এ ভবিষ্যদ্বাণীও বর্তমানকালের মুসলমানদের উপর প্রযোজ্য হচ্ছে। বর্তমানকালের মুসলমান নামধারীদের নিন্দাবাদ থেকে সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত অব্যাহতি পান নি। অনেকে সমালোচনা প্রসঙ্গে মহান পূর্বসূরিগণের প্রতিও অপবাদ আরোপ করে বসে এবং সমালোচনাই তাদের রচনা ও লেখার প্রধান প্রতিপাদ্য হয়ে দাঁড়ায়। তারা হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও পূর্ববর্তী মহান মনীষীবৃন্দের দোষ-ত্রুটিগুলোকে উম্মতের সামনে তুলে ধরাকে বিরাট পুণ্যকর্ম বলে মনে করেন। তাদের ধারণায় উম্মাহ্‌র সংস্কারের জন্য মহান মনীষীবৃন্দের নিন্দা যেন অপরিহার্য বিষয়। তারা যেহেতু সমালোচনাকেই বিরাট পুণ্যকর্ম মনে করেন, তাই নিজেরা কর্মক্ষেত্রে শুধু অপরিপক্বই নয় ; বরং নিতান্ত খর্ব থাকেন। সমালোচনার বৈধতার ব্যাপারে সবচাইতে বড় যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, নবীগণ ছাড়া আর কেউ নিষ্পাপ নন। জনাব, কথাটা সত্য বটে, কিন্তু এতে করে একথা কেমন করে প্রমাণিত হয় যে, যারা নিষ্পাপ হবে না, উম্মাহ্‌র সামনে তাদের সবার ব্যক্তিত্বকেই সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করা এবং ক্ষুদ্র করা পুণ্যকর্ম হয়ে যাবে?

টীকা

* সূরা বাকারার এ আয়াতটি তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ)-এর আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে যাতে তালাকের বিষয়টিকে বিশেষভাবে এবং শরীঅতের অন্যান্য নিয়ম-বিধানকে খেল-তামাশা বা উপহাসে পরিণত করা না হয়। যখন এ ধরনের আচরণকে هزوا বলা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলীর অবমূল্যায়ন হয়, তখন শরীঅতের হুকুম-আহ্‌কামকে চিত্রায়িত করে খেল-তামাশার পর্দায় দেখানো ও দেখাকে কেন هزوا বলা হবে না? বস্তুতই ইসলামী বিষয়কে চলচ্চিত্রের পর্দায় প্রদর্শন করা ধর্মের সাথে উপহাস বৈ নয়। বিষয়টি আসলে সূরা মায়েদার اِتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا — مائده أيت ٥٧ আয়াতে বর্ণিত সে কাফেরদেরই অনুরূপ যাদের নিন্দা করা হয়েছে। এমদাদুল ফতওয়া ৪র্থ খণ্ডঃ করাচী সংস্করণে হজ্জের চলচ্চিত্র নির্মাণকে একাধিক কারণে নিন্দনীয় ও দূষণীয় প্রমাণ করা হয়েছে।

যে সম্পদে যাকাতের অর্থ মিশে যায় তা ধ্বংস হয়ে যায়

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَاخَالَطَتِ الزَّكٰوةُ مَالاً قَطُّ اِلَّا اَهْلَكَتْهُ —— رواه الشافعی

(৯) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে সম্পদে যাকাতের অর্থ মিশে যায়, তা সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। (শাফেয়ী)

জ্ঞাতব্য ঃ এ বক্তব্যটির দু'টি মর্মার্থ হতে পারে এবং উভয়টিই বিশুদ্ধ।

(১) যে সম্পদের যাকাত ওয়াজিব হয়েছে, অথচ তার যাকাত আদায় করা হয় নি; (এমতাবস্থায়) যাকাতের অর্থ সমগ্র সম্পদে মিশে রয়েছে বিধায় যাকাতের সে অর্থ বাকী সমস্ত সম্পদকে ধ্বংস করে দেবে।

(২) আরেক অর্থ এটা হতে পারে যে, যে ব্যক্তির পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা জায়েয নয়, যদি সে ব্যক্তি যাকাতের অর্থ-সম্পদ নিয়ে নিজের সম্পদের সাথে মিশিয়ে নেয়, তাহলে যাকাতের এ সম্পদ তার নিজের আসল সম্পদকে ধ্বংস করে দেবে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে, জলে ও স্থলে যেসব সম্পদ বিনষ্ট হয় তা যাকাত বন্ধ করে দেয়ার কারণেই হয়ে থাকে। (তারগীব ও তারহীব)

পূর্বে উল্লিখিত এক হাদীস থেকে জানা গেছে যে, যাকাত বন্ধ করার কারণে বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হয়। আর এ হাদীসেও জানা গেল যে, যাকাতের সম্পদ যদি অন্য সম্পদের সাথে মিশে থেকে যায়, তাহলে সে সম্পদও ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়ে যায়। এ দু'টি বিষয়ই প্রমাণিত বাস্তব।

অনেক লোক সম্পদের পর সম্পদ জমা করতে থাকে এবং তা থেকে অশ্লীল কার্যকলাপ, পাপানুষ্ঠান ও পার্থিব রেওয়াজ-প্রথায় বেপরোয়া ব্যয় করে, অথচ সামান্যতম অর্থ অর্থাৎ, শতকরা মাত্র আড়াই টাকা যাকাত খাতে গরীব-দুঃখী ও এতীম-মিসকীনকে দান করতে বিরত থাকে। শেষ পর্যন্ত এ ধরনের সম্পদ কখনও অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়, আবার কখনও বন্যায় ভেসে যায়, কখনও চোর-ডাকাত নিয়ে পালায়, কখনও অন্য কোন উপায়ে বিনাশ হয়ে যায়। যে পবিত্র সত্তা (আল্লাহ্

তা'আলা) নিজের অনুগ্রহে সম্পদ দান করেছেন, একান্ত তাঁরই নাফরমানীতে তা লুটাতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করে না, অথচ তাঁর নির্দেশে ব্যয় করতে সংকোচ-বোধ করে।

অনেকের যাকাত দেয়ার ইচ্ছা থাকে; কিন্তু হয় তারা হিসাব-নিকাশ ছাড়া সামান্য কিছু অর্থ দিয়ে মনকে প্রবোধ দেয় কিংবা হিসাব-নিকাশ করলেও হিসাব অনুযায়ী যে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হয় তা দেয় না। বিশেষ করে লক্ষপতি কোটিপতিরা তো হিসাব অনুযায়ী দেয়ই না।

হাদীসের বক্তব্যের আরও একটি অর্থ এরূপ করা হয় যে, যে লোকের জন্য যাকাত নেয়া জায়েয ছিল না, যদি সে লোক যাকাতের অর্থ গ্রহণ করে তাহলে যাকাতের এই (গৃহীত) অর্থ তার অন্য সমস্ত অর্থসম্পদকে ধ্বংস করে দেবে। ইদানীং এ ধরনের লোকেরও কোন অভাব নেই, যাদের জন্য নেসাবের মালিক হওয়া কিংবা সৈয়্যদ হওয়ার কারণে যাকাত নেয়া জায়েয নয়, অথচ তাদের ঘাড়ে পার্থিব লোভ-লালসা এমনভাবে সওয়ার হয়ে থাকে যে, অবস্থা বা বক্তব্যের দ্বারা কিংবা নবী (দঃ)-এর বাণীর মাধ্যমে নিজেদেরকে যাকাতের হকদার মনে করে যাকাত নিয়ে নেয়। বিশেষ করে (মসজিদের) ইমাম, মুয়ায্যিন এবং এমন সব লোক এতে লিপ্ত, যাদের হজ্জ করার আগ্রহ থাকে। নিজের কাছে চার-পাঁচ হাজার টাকা রয়েছে, চাঁদা সংগ্রহ করে হজ্জের জন্য তা ষাট-আশি হাজারে পরিণত করে নিতে চায়, আর মানুষ সাধারণত যাকাতের অর্থ থেকেই মোটা অঙ্কের চাঁদা দান করে থাকে। নিজে নেসাবের মালিক হওয়া সত্ত্বেও এ অর্থ কেমন করে জায়েয হতে পারে? فَاِلَى اللّٰهِ الْمُشْتَكٰى

হারাম পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদে এবাদত-বন্দেগী কবূল হয় না

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا وَّاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ

طَيِّبٰتِ مَارَزَقْنٰكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَّمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَّ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَّغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ — رواه مسلم

(১০) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পবিত্র, পবিত্রকেই তিনি গ্রহণ করেন এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে সে হুকুমই দিয়েছেন যা পয়গম্বরগণকে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি বলেছেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا

অর্থাৎ, হে রাসূলগণ, পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَارَزَقْنٰكُمْ ○

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যাকিছু দান করেছি, তার মধ্য থেকে উত্তম বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর।

অতঃপর মহানবী (দঃ) এমন লোকের কথা বলেছেন, যারা দীর্ঘ সফরে থাকবে, যাদের মাথার চুল আলুথালু এবং দেহ ধূলিমলীন; যারা উপরের দিকে হাত তুলে ইয়া রব্ব, ইয়া রব্ব বলে, অথচ তাদের খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, তাদের পোশাক হারাম এবং তাদের অস্তিত্ব হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট, এতদসত্ত্বেও কেমন করে এদের দো'আ কবূল হতে পারে? (মুসলিম)

এক হাদীসে আছে, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সফরে থাকে ততক্ষণ তাদের দো'আ অবশ্যই কবূল হয়। আর সফরের সাথে সাথে যদি তাদের অবস্থাটাও ভগ্ন ও জীর্ণশীর্ণ হয়, তবে তা দো'আ কবূল হওয়ার জন্য অনুকূল হয়ে যায়। এ হাদীসে বলা হল যে, এসব কিছু সত্ত্বেও সে লোকের দো'আ কবূল হবে না, যার পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম। ইদানীং সীমাহীন দো'আ-প্রার্থনা করা হয় এবং বিপদাপদ দূর হওয়ার জন্য প্রচুর মিনতি সহকারে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে রোদন করা হয়; কিন্তু দো'আ কবূল হয় না। বস্তুত কেমন করেই বা কবূল হবে, যখন হারাম থেকে বেঁচে থাকার চিন্তাই থাকে নি!

হারাম অর্থসম্পদ যেভাবে দো'আর গ্রহণীয়তা প্রতিহত করে, তেমনি নামাযকেও কবূল হতে দেয় না। মেশকাত শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কাছ থেকে একথা না শুনে

থাকি তাহলে আমার কান যেন বধির হয়ে যায় যে, যে লোক দশ দেরহামের একটি কাপড় খরিদ করল তার মধ্যে এক দেরহাম হারাম ছিল, তাহলে যে পর্যন্ত সে কাপড়টি তার দেহে শোভা পাবে, সে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তার নামায কবূল করবেন না। সুতরাং কাপড়ের এক দশমাংশ হারাম টাকার হওয়ার দরুন নামায কবূল না হলে, যার সমস্ত পোশাক ও পানাহারই হারাম তার নামায কেমন করে কবূল হবে?

ইদানীং হারাম উপার্জনের বহু পন্থা প্রচলিত হয়েছে এবং সেগুলো আমাদের জীবনের প্রধান অংশে পরিণত হয়ে গেছে। এছাড়া আধুনিক সভ্যতা সুদের নাম লাভ, ঘুষের নাম উপহার এবং প্রতারণা ও খেয়ানতের নাম দিয়েছে বিচক্ষণতা। নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, ইদানীং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হারাম-হালাল বৈধাবৈধের প্রতি লক্ষ্য রাখাকে মনে করা হয় নির্বুদ্ধিতা। সবাই নির্দ্বিধায় বলে উঠে, জনাব, ব্যবসা হল ব্যবসা। ব্যবসা-বাণিজ্য যেন শরীঅতের হালাল-হারামের বাধ্যবাধকতা বহির্ভূত বিষয়! আল্লাহ্ মাফ করুন! হে মুসলমানগণ, ইসলামসম্মত ব্যবসা করুন। পাশ্চাত্যের খৃষ্টবাদী এবং প্রাচ্যের অংশীবাদী তথা মুশরিকী ধারা আপনাদের জন্য শোভন নয়।

অনেকে বলে ফেলেন, ইদানীং হালাল পাওয়াই যায় না। এটা আত্মপ্রতারণা বৈ নয়। মানুষ যেহেতু হালাল বা বৈধতার চিন্তা রাখার কারণে কিছু বাধ্য-বাধকতায় আবদ্ধ হয়ে যায় এবং হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর ভাষায় اَلْحَلَالُ لَايَحْتَمِلُ السَّرَفَ (অর্থাৎ, হালাল জীবিকায় অপব্যয়ের অবকাশ থাকে না এবং বিলাসী জীবন যাপনের সুযোগ পাওয়া যায় না) তাই নফস এই বাহানা দাঁড় করায় যে, আজকাল তো হালাল খুঁজেই পাওয়া যায় না বিধায় হারাম-হালালের চিন্তা অহেতুক। কিন্তু যাদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় রয়েছে এবং যারা মহানবী (দঃ)-এর বাণীঃ

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ مِّنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَّبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ

(অর্থাৎ, সে মাংস জান্নাতে প্রবেশ করবে না যা হারাম দ্বারা গঠিত হয়। যে মাংস হারাম দ্বারা বর্ধিত হয় তা দোযখের জন্যই অধিক উপযোগী!) শুনেছে, তারা অবশ্যই হালালের প্রতি লক্ষ্য রাখে। আল্লাহ্ তাদেরকে অধিক হারে না হলেও হালাল (জীবিকা)-ই দান করেন। হালালান্বেষীদের পার্থিব প্রয়োজনাদীও অনেক সময় অপূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু আখেরাতের সীমাহীন আযাব থেকে অব্যাহতি

লাভের লক্ষ্যে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে নেয়া প্রত্যেকটি বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য।

এখানে একথাও লক্ষ্যণীয় যে, হালাল প্রাপ্তির জটিলতাও স্বয়ং আমাদেরই সৃষ্ট। মানুষের মাঝে যদি সততা পরহেযগারীর মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং সবাই যদি হালাল উপার্জনের চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে সম্প্রতি হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে যে সব জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে তা কখনোই হত না। কিন্তু (আজকের) পরিস্থিতি হল এমন যে, যাদেরকে দ্বীনদার ও পরহেযগার বলা হয় এবং যারা বছরের পর বছর ধরে নামাযীও বটে, তারাও জীবিকার ব্যাপারে একথা জানার জন্য মুফ্‌তী সাহেবদের শরণাপন্ন হন না যে, আমি এ ধরনের ব্যবসা করতে চাইছি কিংবা অমুক বিভাগে আমি চাকরী পাচ্ছি এটা আমার জন্য জায়েয কিনা? অথবা ব্যবসার ক্ষেত্রে অমুক লেনদেন শরীঅতসম্মত কিনা? অবশ্য সজদায়ে সহু ও ওযূ-গোসলের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে তারা যথেষ্ট জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং সেসবের ব্যাপারে প্রচুর বাহাস-বিতর্কের অবতারণা করে থাকেন। অথচ শরীঅতে প্রত্যেক বিভাগ ও প্রত্যেক বিষয়ে বিধি-বিধান বিদ্যমান রয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্‌সালামের শরীঅতের প্রতি ইহুদীদের আচরণ এমনি ছিল; কোনটা তারা অনুশীলন করত, কোনটাকে পাশ কাটিয়ে চলত। এ বাস্তবতার প্রতিই আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে ইঙ্গিত করেছেনঃ

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

অর্থাৎ, তোমরা কি কিতাবের এক অংশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছ আর এ কিতাবেরই কোন কোন অংশকে অস্বীকার করছ?

ইসলামের দাবীদাররা আজ ইহুদীদের এ ধারায়ই চলছে। শরীঅতের বিধি-বিধানকে শুধুমাত্র যিকির-আযকার, তসবীহ-তাহলীল আর নামায-রোযাতেই সীমাবদ্ধ করে রাখে। অনেক হাজী, নামাযী ও সূফী সাহেবরা কারও জমি বন্ধক রেখে বছরের পর বছর তার উৎপাদন হাতিয়ে নিতে থাকে এবং সুদখোরীর অভিশাপে লিপ্ত হয়ে যায়। অনেক নামাযী ও হাজী মদের ব্যবসা করে কিংবা আবগারী বিভাগে অথবা মদের কারখানায় কর্মচারী খাটে। তথাকথিত কোন কোন মৌলবী ও হাফেয লটারীর মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা কামাই করে। অনেকের শখের বিষয় মানুষকে হজ্জ করানো কিংবা মসজিদ নির্মাণ। কিন্তু তাদের যাবতীয় আয় আসে বাড়ী ও দোকানের অবৈধ সালামী থেকে কিংবা ব্যবসায়িক ধোঁকা-প্রতারণা অথবা অনৈসলামী আইনের আশ্রয়ে কারও সম্পত্তি আত্মসাতের মাধ্যমে। তাদেরকে

তাদের রিপু ও শয়তান একথা বুঝিয়ে রেখেছে যে, সৎ কাজে ব্যয় করে দিলেই হারাম উপার্জনের পাপ শেষ হয়ে যাবে। অথচ এটা হল বিরাট ধোঁকা। মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ সঞ্চয় করেছে এবং অতঃপর তা সদকা-খয়রাত করে দিয়েছে, তাতে তার কোন সওয়াব হবে না; (বরং) তার ঘাড়ে সে সম্পদের অভিশাপ চেপেই থাকবে। আর হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, যে লোক হারাম উপার্জন করবে, যাকাতও তার উপার্জনকে পবিত্র করবে না। (তারগীব ও তারহীব)

সৎকর্মে উৎসাহদান এবং অসৎকর্মে বারণ পরিহার করলে আযাব নেমে আসে

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهٗ وَلَايُسْتَجَابُ لَكُمْ — رواه الترمذى

(১১) হযরত হোযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সে মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্য অবশ্যই সৎকর্মের নির্দেশ দিতে থাক এবং অসৎকর্ম থেকে বারণ করতে থাক। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর নিজের (পক্ষ থেকে) আযাব পাঠিয়ে দেবেন। তখন আল্লাহ্‌র কাছে তোমরা দো'আ-প্রার্থনা করবে, অথচ তা কবূল হবে না। (তিরমিযী)

মুসলমানদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, নিজে সৎ হয়ে থাকবে; বরং মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য নাফরমান বান্দাদেরকে পাপকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং সৎকর্মে নিয়োজিত করাও তাদের একান্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছেঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ ط آل عمران آيت ١١٠

অর্থাৎ, তোমরা হলে উত্তম উম্মত বা সম্প্রদায়, মানুষের (কল্যাণের) জন্য যাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে, তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান স্থাপন কর।

(সূরা আলে এমরান, আয়াত ১১০)

এ আয়াতে মহানবী (দঃ)-এর উম্মতকে সমস্ত উম্মত (জাতি-সম্প্রদায়) অপেক্ষা উত্তম বলা হয়েছে এবং 'আম্‌র বিল্‌ মা'রূফ' (তথা সৎকর্মের নির্দেশ দান) ও 'নাহী আনিল্‌ মুন্‌কার'কে (অর্থাৎ, অসৎকর্মে বারণ করাকে) এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়টি ফেকাহ্‌র দৃষ্টিতে অবশ্য ব্যক্তি ও অবস্থা ভেদে কখনও ফরযে কেফায়াহ, কখনও মুস্তাহাব এবং কখনও ওয়াজিবের পর্যায়ে এসে যায়। কিন্তু যে কোন অবস্থায় 'আম্‌র বিল্‌ মা'রূফ' ও 'নাহী আনিল মুনকার' এ উম্মতের বিশেষ দায়িত্ব। কোরআনে আরও বলা হয়েছেঃ

وَالْمُـؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَـوْنَ عَنِ الْمُنْكَـرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ ط توبة أيت ٧١

অর্থাৎ, আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মহিলারা পারস্পরিকভাবে একে অপরের (ধর্মীয়) সুহৃদ ও অভিভাবক। তারা (পরস্পরকে) সৎকর্মের উপদেশ প্রদান করে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করে। নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে। (সূরা তওবা, আয়াত ৭১)

এ আয়াতের 'আম্‌র বিল মা'রূফ' ও 'নাহী আনিল মুন্‌কার'কে ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ দুনিয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ভুলে যায় এবং আখেরাতের নেয়ামত তথা আশীর্বাদের উপর তাদের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে দুনিয়ার নেয়ামত ও স্বাদ-আহ্লাদকেই মুখ্য মনে করে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মানুষের এসব শৈথিল্যের অবসান এবং আখেরাত স্মরণ করিয়ে দিতে এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আকৃষ্ট করতে স্মরণ ও প্রচার এবং تَذْكِيْرُ উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে। যখন এ ধারা অব্যাহত থাকে, তখন উম্মতের সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীতে ধর্মীয় বিধিমালা অনুযায়ী চলার রেওয়াজ ব্যাপকতা লাভ করে। ফলে আল্লাহ্ পাকের রহমত ও সাহায্য তাদের সঙ্গে থাকে। পক্ষান্তরে আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব যদি যথাযথভাবে পালিত না হয়, তাহলে দু'টি কারণে আযাব এসে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ এ কারণে যে, আমর বিল মা'রূফ ও

নাহী আনিল মুনকার (সৎকর্মের নির্দেশ ও অসৎকর্মে বাধা দান) হল (মুসলমানদের জন্য) নির্ধারিত ফরয যা বর্জন করা ধ্বংস ও বিনাশের কারণ। দ্বিতীয়তঃ এ ফরযে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে মানুষের মাঝে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের মন মানসিকতা থাকে না এবং পাপ প্রবল হয়ে উঠে। ফলে, নানা রকম বিনাশ ও ধ্বংস নেমে আসে।

আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার পালনে শৈথিল্যের কারণে যখন সাধারণ আযাব নেমে আসবে, তখন যে দো'আ-প্রার্থনা করা হবে, তা-ও বিফল হবে। যেমন হাদীসে বলা হয়েছেঃ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهٗ وَلَايُسْتَجَابُ لَكُمْ এ বাস্তবতা বারবার প্রদর্শিত হয়েছে।

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযূরে আকরাম (দঃ) এরশাদ করেছেন, (একবার) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জিবরাঈল (আঃ)-কে হুকুম করলেন, অমুক নগরীকে তার অধিবাসীদেরসহ উল্টে দাও। (অর্থাৎ, ভূমির উপরের অংশকে নীচে এবং নীচের অংশকে উপরে করে দাও যাতে সেখানকার লোকেরা ধ্বংস হয়ে যায়।) জিবরাঈল (আঃ) নিবেদন করলেন, হে আমার পালনকর্তা, সেসব লোকের মাঝে অমুক লোকটি তোমার এমন বান্দা, যে নিমেষের জন্যও তোমার নাফরমানী করে নি। (অন্তত তাকে বাঁচিয়ে দেয়া হোক।) আল্লাহ্ পাক বললেন, তাকে সহই নগরটিকে উল্টে দাও। কারণ, আমার ব্যাপারে তার চেহারা কখনও মলিন হয় নি। (বায়হাকী) অর্থাৎ, সে নিজে সৎ বটে; কিন্তু সে বারংবার (মানুষকে) পাপ করতে দেখেছে, তথাপি মুখে বাধা দেয়া তো দূরের কথা, তার কপালে (বিরক্তির) কুঞ্চন পর্যন্ত পড়ে নি কিংবা পাপের বিরুদ্ধে তার চেহারায় ক্ষোভের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নি।

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, নিজে সৎ ও অনুগত হয়ে বসে থাকা দ্বীনদার ও ধার্মিক হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং অন্যান্য মানবমণ্ডলীকেও আল্লাহ্‌র নির্দেশের উপর পরিচালনার চিন্তা-ভাবনা করা অপরিহার্য।

মেশকাত শরীফে আবু দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্‌র উদ্ধৃতিতে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়ত করা হয়েছে যে, মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, যাদের ভেতরে এমন কোন লোক থাকে যে পাপে লিপ্ত, অথচ তারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার অবস্থা পরিবর্তন না করে, তবে তাদের [illegible]

তাপীদের সাথে যে মেলামেশা করে এবং পার্থিব স্বার্থের জন্য পাপকর্ম হতে দেখেও চুপটি মেরে থাকে) তার এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমালংঘনকারীদের দৃষ্টান্ত এমন—যেমন কিছু লোক (দুই শ্রেণী বা ক্লাসবিশিষ্ট) জাহাজে আরোহণ করল এবং লটারীর মাধ্যমে শ্রেণী বিভাগ হয়ে গেল। (উপরের শ্রেণীতে রান্না-বান্না ও পান করার পানি রক্ষিত রয়েছে) সুতরাং নীচের শ্রেণীর লোকেরা উপরের শ্রেণীর লোকদের কাছে দিয়ে পানির জন্য যাতায়াত করে, যার ফলে উপরের শ্রেণীর লোকদের কষ্ট হয়। নীচের লোকেরা তাদের কষ্টের কথা অনুভব করে কুঠার নিয়ে (জাহাজের) তলদেশে ছিদ্র করতে শুরু করে দেয় (যাতে সাগর থেকে প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করতে পারে, উপরে যেন আর যেতে না হয়)। এ ঘটনা লক্ষ্য করে উপরের লোকেরা এসে বলতে থাকে, এ কি করছ? নীচের লোকেরা উত্তর দেয়, আমাদের জন্য তোমাদের কষ্ট হয় অথচ পানি ছাড়া আমাদের কোন উপায়ও নেই। (তাই আমরা আমাদের কাছে থেকেই পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা করছি।) এ উত্তর শুনে যদি উপরের লোকেরা নীচের লোকদের হাত ধরে ফেলে, তাহলে তাদেরকেও (ডোবা থেকে) অব্যাহতি দান করবে এবং নিজেরাও অব্যাহতি লাভ করবে। আর যদি তাদেরকে ছেড়ে দেয় (যে, যা খুশী তাই করুক), তাহলে তাদেরকেও ধ্বংস করবে এবং নিজেরাও ধ্বংস হবে। (বুখারী) অর্থাৎ, পাপের দরুন যে বিপদ আসবে, তাতে সে নিজেও নিমজ্জিত হবে, যে কার্যত নিজে সৎকর্ম সম্পাদন করে; কিন্তু পাপীদেরকে পাপ থেকে বিরত করে না যাদের জন্য বিপদের সূচনা হয়।

এখন আমরা যদি নিজেদের অবস্থা পর্যালোচনা করি, তাহলে বুঝা যাবে, আমরা শুধু পাপকে সহ্যই করছি না, বরং নিজেদের নিকটজনদেরকে, বন্ধুবান্ধবকে এবং আয়ত্তাধীনদেরকে সহায়তা দিয়ে পাপকর্মের সুযোগ করে দিচ্ছি এবং পাপের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। স্ত্রী-কন্যা বেনামাযী হলে কোন পরোয়া নেই। বন্ধুবান্ধবের উপর যাকাত ওয়াজিব; কিন্তু তাদেরকে এ ফরয আদায়ে উদ্বুদ্ধ করার প্রতি কোন লক্ষ্য নেই। কত বন্ধুর উপর হজ্জ ফরয যাদের সাথে মিলেমিশে খাওয়া দাওয়া করছি, অথচ তাদেরকে হজ্জে পাঠাবার কোন চিন্তা নেই। কত দাড়ি না রাখা লোকের সাথে সম্পর্ক, অথচ তাদেরকে পবিত্র শরীঅতের নির্দেশের আলোকে পরিচালিত করার কোন খেয়াল নেই। ছেলেমেয়েদেরকে নিজেরাই নাজায়েয পোশাক বানিয়ে দেই। গোটা পরিবার এক সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাই। এভাবে কেমন করে পাপ বন্ধ হবে, কেমন করে আল্লাহ্র রহমত নাযিল হবে? পরিস্থিতি দ্রুত এমন নাযুক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, কোন কোন যুবক আল্লাহ্র ভয়ে দাড়ি রেখে ফেললে কারণে আযাব এসে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ এ কারণে যে, আমর [illegible]

অফিসের অন্যান্য সহকর্মীরা বলপূর্বক তার হাত-পা চেপে ধরে তা কামিয়ে দেয়। ইন্না লিল্লাহ্............!

মহানবী (দঃ)-এর বাণী—তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মন্দ বিষয় দেখবে, সে নিজের হাতের (ক্ষমতা) দ্বারা তা পাল্টে দেবে। সে ক্ষমতা না থাকলে মুখে তা পাল্টে দেবে। আর যদি সে ক্ষমতা (-ও) না থাকে, তাহলে নিজের মনে মনে তা পাল্টে দেয়ার প্রত্যয় লালন করবে। (অর্থাৎ, মনে মনে তাকে মন্দ জানবে।) (অতঃপর বলেছেন,) এটা হল (অর্থাৎ, শুধু মনে মনে মন্দ জানা এবং মুখ ও হাত ব্যবহার না করা) ঈমানের দুর্বলতর পর্যায়। (মুসলিম)

ব্যভিচার ও সুদের দরুন আল্লাহ্র আযাব নেমে আসে

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ذَكَرَ حَدِيْثًا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِيْهِ مَاظَهَرَ فِىْ قَوْمٍ نِ الزِّنَا وَالرِّبٰوا اِلَّا اَحَلُّوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ — رواه ابو يعلى

(১২) হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, যাদের মাঝে ব্যভিচার ও সুদ বিস্তার লাভ করল, তারা নিজেদের উপর আল্লাহ্র আযাব নামিয়ে নিল। (তারগীব ও তারহীব-আবু ইয়া'লা থেকে)

পবিত্র এ হাদীসের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যিনা (ব্যভিচার) ও সুদের ব্যাপক প্রচলন হয়ে যাওয়া আযাব নেমে আসার কারণ। (ইদানীং) এ দু'টি বিষয়ের প্রচলন কম বেশী বিভিন্ন এলাকায় ও জনপদে হয়ে গেছে। সুদ অত্যন্ত মন্দ ব্যাধি। দুনিয়া ও আখেরাতে এর পরিণতি ও ফলাফল অত্যন্ত মন্দ। কোরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَايَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط — بقره ايت ٢٧٥

অর্থাৎ, যেসব লোক সুদ খায় (কিয়ামতের দিন) তারা উঠবে না; কিন্তু ঠিক সে ব্যক্তির মতই (উঠবে) যাকে শয়তান জড়িয়ে (ধরে) হতভম্ব করে দেয়।

(সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫)

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন সুদের প্রতি, সুদখোরদের প্রতি, সুদদাতাদের

প্রতি এবং সুদের সাক্ষীদের প্রতি। তিনি আরও বলেছেন যে, এরা সবাই (পাপের ক্ষেত্রে) সমান। (মুসলিম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, (মে'রাজের) যে রাতে আমাকে ভ্রমণ করানো হয়, তাতে এমন লোকদের কাছ দিয়ে আমাকে অতিক্রম করতে হয়, যাদের পেট ছিল ঘরের মত। বাইরে থেকে যাদের পেটের ভেতরে সাপ ভর্তি দেখা যাচ্ছিল। আমি বললাম, হে জিবরাঈল, এরা কারা? তিনি উত্তর দিলেন, এরা সুদখোর। (মেশকাত—আহমদ ও ইবনে মাজাহ্ থেকে)

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে সুদের একটি দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) ভোগ করবে, এর পাপ ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও মারাত্মক (বিবেচিত হবে)।

এক হাদীসে সুদকে মায়ের সাথে যিনা করার চাইতেও কঠিন (পাপ) বলা হয়েছে। (মেশকাত)

বুখারী শরীফে মহানবী (দঃ)-এর এক স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। তাতে একথাও রয়েছে যে, মহানবী (দঃ) সুদখোরদেরকে রক্তের নদীতে এমনভাবে দেখলেন যে, ওরা নদীর মাঝে রয়েছে, আর এক লোক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে। তার সামনে রয়েছে পাথর। যখনই সে নদীর ভেতর থেকে উঠে আসতে চায়, তখন পাড়ের লোকটি তার মুখের উপর এমন সজোরে পাথর ছুঁড়ে মারে, যাতে সে যেখানে ছিল সেখানেই পৌঁছে যায়। (মেশকাত স্বপ্ন অধ্যায়) নবীগণের স্বপ্ন সত্য। এ স্বপ্নে সে আযাব দেখানো হয়েছে যা বরযখে (মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের নাম) সুদখোরদের উপর হয়ে থাকে। সুদের সম্পদে কোন বরকত নেই। কোরআনে বলা হয়েছেঃ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط — بقره آيت ٢٧٦

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে বিলুপ্ত করে দেন এবং সদকাকে (দান খয়রাতকে) বাড়িয়ে দেন। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৬)

হাদীসে আছে, মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ الرِّبٰوا وَاِنْ كَثُرَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهٗ تَصِيْرُ اِلٰى قُلٍّ — مشكوة شريف

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে সুদ যদি অনেক বেড়েও যায় (কিন্তু) নিশ্চিতই তার পরিণতি হ্রাসের দিকেই থাকে। (মেশকাত)

এবার নিজেদের অবস্থারও খতিয়ান নিয়ে দেখা দরকার, সুদ আমাদের সমাজে কতটা জায়গা দখল করে আছে। প্রথমে পবিত্র শরীঅতের এ বিধানটি হৃদয়ঙ্গম করে নিন যে, ঋণের মাধ্যমে যে লাভ হয় তাই সুদ। এ মূলনীতি অনুযায়ী বিপুল সংখ্যক লোক সুদের লেনদেন করে থাকে। কোন অভাবগ্রস্ত লোককে টাকা-পয়সা দিয়ে বাড়ি বা জমি বন্ধক রেখে নেয় এবং অতঃপর জমির উৎপাদন ভোগ করে কিংবা বাড়ি ব্যবহার করে। এমনটি সরাসরি সুদ। কোন কোন অঞ্চলে এটি এত অধিক প্রচলিত যে, এতে নির্লিপ্ত কোন পরিবারই খুঁজে পাওয়া কঠিন। ব্যাংক বা ডাকঘরে অর্থ জমা করে আসল অর্থের অতিরিক্ত টাকা নেয়াও সুদ। কোন কোন লোক একে জায়েয করার জন্য এমন দলীল উপস্থাপন করেন যে, ব্যাংক যেহেতু ব্যবসা করে থাকে এবং আমাদের অর্থ থেকে লাভ কামাই করে, সুতরাং আমরাও লাভই নিয়ে থাকি। কিন্তু মহোদয়! নাম পাল্টালেই স্বরূপ পাল্টে যায় না; শরীঅতের মূলনীতি অনুযায়ী সেটি সুদই বটে। আপনাকে যদি ব্যাংক ব্যবসায়ে অংশীদার করে নিয়ে থাকে, তাহলে বলুন, আপনি কত শতাংশের অংশীদার? তাছাড়া আপনি যদি অংশীদার হয়ে থাকেন, তবে কখনও ক্ষতিরও অংশীদার হন কিনা? ব্যাংকের লাভ হোক কি ক্ষতি, সর্বাবস্থায় আপনি পুরো অর্থ এবং নির্ধারিত তথাকথিত লাভ পাবেন—এটাই তো সুদ।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন কাউকে কোন ঋণ-ধার দেবে, তখন ঋণ গ্রহীতা কোন উপহার-উপঢৌকন দিলে কিংবা নিজের বাহনে চড়িয়ে নিলে তাতে চড়বে না, উপঢৌকনও গ্রহণ করবে না। অবশ্য যদি ঋণ গ্রহণের পূর্বে উভয়ের মাঝে উপঢৌকনের লেনদেনের রীতি থেকে থাকে তাহলে গ্রহণ করা যেতে পারে। (ইবনে মাজাহ্)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) এক লোককে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বললেন, তুমি এমন জনপদে বসবাস করছ যেখানে সুদের বহুল প্রচলন রয়েছে। সুতরাং যখন কারও উপর তোমার কোন হক (প্রাপ্য) থাকবে, সে তোমাকে ভূষির বস্তা কিংবা যবের বোঝা অথবা কিৎ (এক প্রকার ঘাস)-এর দড়ি উপহার হিসাবে দিলেও (অর্থাৎ, কোন নগণ্য বস্তু হলেও) তা গ্রহণ করো না। কারণ, তা (হবে) সুদ। (বুখারী)

জ্ঞাতব্যঃ ঋণ গ্রহণের দরুন তোমার প্রতি আনত হয়ে কিংবা তোমাকে সমীহ করে ঋণ গ্রহীতা যদি কোনকিছু উপহার-উপঢৌকন অথবা স্বার্থ দান করে, তাহলে তাও সুদ। আর ঋণের কারণে যদি উপঢৌকন না দিয়ে থাকে; বরং পুরনো বন্ধুত্ব সম্পর্কের কারণে দেয়, তবে তা বৈধ।

নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্ষেত-খামারের ব্যাপারে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা করে চলা এবং যাবতীয় সুদ ও সুদের সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা সমস্ত মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য। فَدَعُوا الرِّبٰوا وَالرِّيْبَةَ

ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিক কসম খেলে বরকতহীনতা সৃষ্টি হয়

وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلَفِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهٗ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ — رواه مسلم

(১৩) হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন, ব্যবসায়ে অধিক পরিমাণে কসম খাওয়া থেকে বাঁচ। কারণ, কসম পণ্য বিক্রি করিয়ে দেয়, (কিন্তু) পরে বরকত খতম করে দেয়। (মুসলিম)

সুদের পণ্যে যেমন বরকত হয় না তেমনি কসমের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করলেও বরকত উঠে যায়। হাদীসে বলা হয়েছে, বেচতে গিয়ে অধিক কসম খাওয়া পরিহার কর। কারণ, কসমে পণ্যের কাটতি হয় বটে, কিন্তু বরকত চলে যায়। হাদীসটিতে প্রথমতঃ 'অধিক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়তঃ কসমকে শর্তহীন রেখে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ, পণ্য বিক্রি করতে গিয়ে বেশী কসম খেয়ো না, কসম যদি সত্যও হয়। তবে কখনো কখনো মুখ থেকে কসম বেরিয়ে গেলে আর কসমটি সত্য হলে তার অবকাশ রয়েছে। যখন সত্য কসমের আধিক্য বারণ করা হয়েছে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করা কতখানি মন্দ এবং বরকতের পরিপন্থী হবে তা বলাই বাহুল্য।

একবার মহানবী (দঃ) বলেছেন, তিনটি লোক এমন আছে, যাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন (রহমতজনক) কথা বলবেন না এবং (রহমতের দৃষ্টিতে) তাদেরকে দেখবেনও না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। হযরত আবু যর (রাঃ) বললেন, তাদের মন্দ হোক ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওরা কারা? মহানবী (দঃ) উত্তরে বললেন; (১) যারা টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে কাপড় পরে, (২) যারা এহ্সান (করুণা) করে খোঁটা দেয় এবং (৩) যারা মিথ্যা কসমের মাধ্যমে ব্যবসা পণ্যের কাটতি বাড়ায়। (মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, বড় বড় কিছু গুনাহ হল—(১) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, (২) পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, (৩) কোন লোককে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করা, (৪) মিথ্যা কসম খাওয়া। (বুখারী) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ

اَلْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ تَذْهَبُ الْمَالَ

অর্থাৎ, মিথ্যা কসম সম্পদকে বিনাশ করে দেয়। অন্য আরেক রেওয়ায়তে আছে—

اَلْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَّارَ بِلَاقِعٍ

অর্থাৎ, মিথ্যা কসম জনপদকে বিরান করে দেয়। (তারগীব ও তারহীব)

তদুপরি মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক নিজের কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমান লোকের পণ্য (অন্যায়ভাবে) হাতিয়ে নেয়, আল্লাহ্ তার জন্য দোযখ ওয়াজিব করে দেন এবং তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সামান্য বস্তু হলেও কি? বললেন, পিলু বৃক্ষের ডাল হলেও (যদ্দ্বারা মেসওয়াক তৈরী করা হয়)। (মুসলিম)

আমরা যদি আমাদের ব্যবসায়ীদের প্রতি এক নজর তাকিয়ে দেখি, তাদের মধ্যে পণ্য বিক্রিতে সত্য ও মিথ্যা কসম খাওয়ার কি পরিমাণ প্রচলন রয়েছে, তবে তার বিপুল প্রচলন দেখতে পাব। আর তদ্দরুন যে বরকতহীনতা দেখা দেয়, সতর্ক লোকেরা সে ব্যাপারে অনবহিত নয়।

মানুষের প্রয়োজনের সময় খাদ্যশস্য আটকে রাখার শাস্তি

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اِحْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللّٰهُ بِالْجُذَامِ وَالْاِفْلَاسِ — رواه ابن ماجة وغيره

(১৪) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) -কে বলতে শুনেছি, যেসব লোক মূল্যবৃদ্ধির অপেক্ষায় খাদ্যশস্য আটকে রাখে (এবং প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের কাছে তা বিক্রি করে না) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কুষ্ঠব্যাধি ও দারিদ্র্যের শাস্তি দান করেন। (ইবনে মাজাহ্ প্রভৃতি)

খাদ্যশস্যের ব্যবসা করা জায়েয এবং মওসুমের সময় খরিদ করে পরে দাম বাড়লে বিক্রি করে দেয়াও জায়েয; কিন্তু যখন মানুষের খাদ্যশস্যের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সাধারণভাবে তা পাওয়া না যায়, তখন মূল্যবৃদ্ধির অপেক্ষায় ধরে রাখা পাপ। এমন যারা করবে তাদেরকে হাদীসে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। উপরোল্লিখিত হাদীসে বলা হয়েছে, এ ধরনের লোককে আল্লাহ্ তা'আলা কুষ্ঠব্যাধি ও দারিদ্র্যের শাস্তি দান করবেন। অর্থাৎ, এ ধরনের গর্হিত আচরণের জন্য সে দৈহিক ও আর্থিক উভয় রকম শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। দেহে কুষ্ঠের ন্যায় মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি হবে এবং যে সম্পদের লোভে মূল্যবৃদ্ধির অপেক্ষায় খাদ্যশস্য আটকে রেখেছিল তা-ও ধ্বংস হবে এবং দারিদ্র্য ছেয়ে যাবে।

এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন, যে লোক মূল্যবৃদ্ধির অপেক্ষায় চল্লিশ দিন খাদ্য-শস্য আটকে রাখল, সে আল্লাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষুব্ধ হলেন।

আরেক হাদীসে আছে, যে লোক (ব্যাপক গণচাহিদা সত্ত্বেও) খাদ্যশস্য চল্লিশ দিন কুক্ষিগত করে রাখল এবং পরে তা খয়রাত করে দিল, তাহলে তা (সদকা) সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না (যা শস্য আটকে রাখার দরুন হয়েছে)।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আরও বলেছেন, সে বান্দা মন্দ (লোক), যে (প্রয়োজনের সময়) খাদ্যশস্য আটকে রাখে (এবং তার মানসিকতা এমন যে), আল্লাহ্ দর কমিয়ে দিলে সে মনঃক্ষুণ্ণ হয় এবং বাড়িয়ে দিলে খুশী হয়। (এসব হাদীস মেশকাত শরীফের 'পুঞ্জিভূত করণ' অধ্যায় থেকে গৃহীত হয়েছে।)

মাতাপিতাকে কষ্ট দেয়ার শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেই পেয়ে যেতে হয়

وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللهُ مِنْهَا مَاشَاءَ اِلَّا حُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهٗ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهٖ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ — رواه البيهقى فى شعب الايمان

(১৫) আবু বাকরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে যে কোন পাপ ক্ষমা করে দেন, কিন্তু মাতাপিতাকে উত্যক্ত করার শাস্তি পৃথিবীতে মৃত্যুর পূর্বেই দিয়ে দেন। (বায়হাকী শো'আবুল ঈমান গ্রন্থে)

আল্লাহ্ পাক মাতাপিতার বিরাট মর্যাদা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার হুকুম কোরআন মজীদে উদ্ধৃত হয়েছে এবং তাঁদের জন্য এভাবে দো'আ করতে বলা হয়েছে— رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, আমার মাতাপিতার প্রতি রহম কর, যেভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এক ব্যক্তি নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সন্তানের উপর পিতামাতার হক কি? তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম। (ইবনে মাজাহ্) অর্থাৎ, তুমি ইচ্ছা করলে তাঁদের সেবাযত্ন করে এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রেখে জান্নাত অর্জন করে নিতে পার এবং ইচ্ছা করলে তাঁদের নাফরমানী করে জাহান্নামে চলে যেতে পার। পিতামাতার নাফরমানীর অভিশাপ আখেরাতে যা হবার তা তো হবেই, দুনিয়াতেও সেজন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। উপরোক্ত হাদীসে তা-ই উল্লেখ করা হয়েছে।

পিতামাতা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখা এবং তাদের খবরাখবর নেয়াও নিতান্ত জরুরী। শরীঅতের পরিভাষায় একে বলা হয় 'সেলা রেহমী' (আত্মীয় বাৎসল্য)। পরবর্তী হাদীসে এর আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদনের ফলে আল্লাহ্র রহমত অবতীর্ণ হয় না

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَاتَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رِحْمٍ — رواه البيهقى فى شعب الايمان

(১৬) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলতে শুনেছি, যেসব লোকের মাঝে কোন আত্মীয়তা ছেদনকারী থাকে, তাদের উপর আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় না। (শো'আবুল ঈমানে বায়হাকী)

'কাতেয়ে রেহম' তথা আত্মীয়তা ছেদনকারীর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা এতই অসন্তুষ্ট হন যে, শুধুমাত্র আত্মীয়তা ছেদনকারীই আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত

থাকে না; বরং যাদের ভেতরে সে অবস্থান করে তাদের প্রতিও আল্লাহ্র রহমত অবতীর্ণ হয় না। যেমন উপরের হাদীসে বলা হয়েছে। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, আত্মীয়তা ছেদনকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

পবিত্র শরীঅতে আত্মীয় বাৎসল্যের বিরাট মর্যাদা রয়েছে। বিভিন্ন পন্থায় কোরআন-হাদীসে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, নিজের বংশধারা জেনে নাও, যাতে আত্মীয় বাৎসল্য সম্পাদন করতে পার। কারণ, সেলা রেহমীর (আত্মীয় বাৎসল্যের) দরুন পরিবারে প্রীতি সৃষ্টি হয়, সম্পদে উন্নতি হয় এবং মৃত্যু বিলম্বিত হয় (অর্থাৎ, আত্মীয় বৎসল লোকেরা দীর্ঘজীবী হয়)। (তিরমিযী)

বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়ত করেছেন যে, মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক তার রিযিক ও আয়ু বৃদ্ধি পছন্দ করে, তার উচিত সেলা রেহমী (আত্মীয় বাৎসল্য) করা। পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন মুশরিক-কাফির হলেও তাদের সাথে সেলা রেহমী এবং সদাচার করার প্রতিদান বিরাট।

মহানবী (দঃ) সেলা রেহমীর ব্যাপারে এত বেশী তাকীদ করেছেন যে, যে আত্মীয় আত্মীয়তা ছেদন করে তার সাথেও বাৎসল্য প্রদর্শনের তাকীদ করেছেন। সুতরাং বলা হয়েছেঃ

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئْ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِىْ اِذَا قُطِعَتِ الرَّحْمَةُ وَصَلَهَا —— رواه البخارى

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি আত্মীয় বৎসল নয়, যে বিনিময় পরিশোধ করে মাত্র; বরং আত্মীয় বৎসল হল সে লোক, যখন তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হয়, তখন সে সম্পর্ক স্থাপন করে। (বুখারী)

অর্থাৎ, একথা ভাববে না যে, অমুক আত্মীয় তো আমার সাথে দেখাই করে না, আমি কেন তার সাথে দেখা করতে যাব। কারণ, এ মনোভাব সম্পর্ক রক্ষার নয়; বরং এ হল প্রতিদান দেয়ার মনোভাব।

পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা, তাদের খবরা-খবর রাখা, তাদের সাথে দেখা করতে যাওয়া, আর্থিক সাহায্য করা, উপহার-উপঢৌকনের লেনদেন করা, দুঃখ-বেদনায় কাজে লাগা, চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান প্রভৃতি সবই সেলা রেহমী তথা আত্মীয় বাৎসল্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাই বলে আত্মীয়তার প্রেরণায় কোন রকম পাপকর্ম করা (কোনক্রমেই) জায়েয নয়। যেমন,

অনেকে বিয়ে-শাদী ও জন্ম-মৃত্যুর শরীঅত বহির্ভূত রেওয়াজ-প্রথা আত্মীয়তার চাপে সম্পাদন করে থাকে।

সেলা রেহমীর শরীঅতসম্মত বিধানের প্রতি লক্ষ্য না করার দরুন বড় বড় পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় এবং পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও আত্মকলহ ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে সম্পর্ক ভাল রাখার কারণে পারিবারিক বিষয়াদিও সঠিক পন্থায় পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় এবং অন্যদের হাসার সুযোগ হয় না। আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আয়ু ও জীবিকায় যে বরকত হয়, তা হয় অতিরিক্ত প্রাপ্তি।

নামাযের কাতার সোজা না করলে অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি হয়

وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ نِ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلٰوةِ وَيَقُوْلُ اِسْتَوَوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ اُولُوا الْاَحْلَامِ وَ النُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَاَنْتُمُ الْيَوْمَ اَشَدُّ اِخْتِلَافًا —— رواه مسلم

(১৭) হযরত আবু মাসঊদ আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামাযে (কাতার ঠিক করার জন্য) আমাদের কাঁধে ধরতেন (অর্থাৎ, মুকতাদীদের কাঁধ ধরে ধরে নিজের হাতে মেলাতেন এবং কাতার ঠিক করে দিতেন।) আর বলতেন, সমান হয়ে যাও; বেঢপ পন্থায় দাঁড়িও না। অন্যথায় তোমাদের অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে যাবে। (তিনি আরও বলতেন,) তোমাদের মাঝে যারা বুদ্ধিমান তারা আমার সাথে মিশে (অর্থাৎ, ইমামের কাছে) দাঁড়াবে। তারপর তারা (দাঁড়াবে) যারা (বুদ্ধি-বিবেচনায়) তাদের নিকটবর্তী, তারপর (দাঁড়াবে) তারা, যারা (বুদ্ধি-বিবেচনায়) তাদের নিকটবর্তী। হাদীসের রেওয়ায়তকারী আবু মাসঊদ আনসারী (রাঃ) (উপস্থিত লোকদেরকে) বললেন, (যেহেতু তোমরা কাতার ঠিক করার ব্যাপারে লক্ষ্য রাখ না) তাই আজ তোমাদের মাঝে কঠিন মতবিরোধ। (মুসলিম)

বাইরের প্রভাব ভেতরে এবং ভেতরের প্রভাব বাইরে পড়ে। বাহ্য দেহগুলো যখন এক সরল রেখায় সমান হয়ে না দাঁড়ায়, তখন কাতারের বক্রতার প্রভাব

মনের উপর পড়ে এবং বিরোধ ও ভাঙ্গনের মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়। হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তাদীদের কাছে গিয়ে গিয়ে তাদের কাঁধ ধরে ধরে সোজা করতেন এবং যখন কাতার ঠিক হয়ে যেত, তখন তাকবীরে তাহরীমা শুরু করতেন। যথেষ্ট মিলেমিশে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যেমন মুক্তাদীদের দায়িত্ব, তেমনি ইমামের পদমর্যাদার তাকাদা হল কাতারগুলোকে সোজা করা।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, নিজেদের কাতারগুলো সমান করে নাও। কারণ, কাতার সমান হওয়া নামাযের পরিপূর্ণতার একটি অংশ। (মুসলিম) মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, ইমামকে মাঝে নিয়ে নাও এবং ভেতরের ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে দাও। (আবু দাঊদ) তিনি বলেন, কাতারগুলো সোজা কর এবং নিজেদের কাঁধগুলোকে একটি সরল রেখায় রাখ, নিজের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও এবং ফাঁকা জায়গাগুলো বন্ধ করে দাও। কারণ, শয়তান তোমাদের মাঝে (কাতারের ভেতরকার ফাঁকা জায়গায়) বাঘের বাচ্চার মত ঢুকে পড়ে। (আহমদ)

এই যে বলা হয়েছে, "নিজের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও," এর মর্মার্থ হল এই যে, কাতার ঠিক করতে কিংবা স্থান পূরণ করার জন্য যখন অন্য নামাযী তোমাকে নিজের দিকে টানে, তখন নম্রতার সাথে মিলে যাও; রাগ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। হযরত আবু মাসঊদ (রাঃ) নিজের যুগের লোকদেরকে বলেছেন, আজ তোমাদের মাঝে কঠিন মতবিরোধ। যদি তিনি আজকের মুসলমানদের কাতারের বেঢপ অবস্থা এবং তার ফলে বর্তমান ভাঙ্গন ও মতবিরোধ দেখতেন, তাহলে আল্লাহ্ জানেন কি বলতেন।

হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তারা আমার কাছে থাকবে।" তার অর্থ হল, প্রথম কাতারে ইমামের নিকটবর্তী দাঁড়াবেন সতর্ক-সচেতন ও বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন লোকেরা এবং বিশেষ গুরুত্বসহকারে নিজেদের জায়গায় পৌঁছাবেন, যাতে প্রয়োজনবোধে ইমাম হতে পারেন অথবা ইমামের কোন ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে তাঁকে লোকমা (সুধরে) দিতে পারেন। প্রথম শ্রেণীর ধর্মীয় বিবেকসম্পন্ন লোকদের কাছাকাছি দাঁড়াবেন সেসব লোক যারা ধর্মীয় বিচক্ষণতায় তাদের পরবর্তী পর্যায়ভুক্ত। তারপর দাঁড়াবে তারা যারা ধর্মীয় বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর চাইতেও পেছনে।

সারকথা, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে—যেন তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা নেন এবং প্রথম কাতারে পৌঁছান।

ওলীআল্লাহ্গণের সাথে শত্রুতার অভিশাপ

وَعَنْ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ وَّمَنْ عَادٰى لِلّٰهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللهَ بِالْمُحَارَبَةِ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَتْقِيَاءَ الْاَخْفِيَاءَ الَّذِيْنَ اِذَا غَابُوْا لَمْ يَتَفَقَّدُوْا وَاِنْ حَضَرُوْا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوْا قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ —— رواه ابن ماجة والبيهقى فى شعب الايمان

(১৮) হযরত মুআয ইবনে জবল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বলতে শুনেছি, সামান্যতম রিয়াকারী (লোক দেখানোও) শিরক। এবং (তিনি আরো বলেছেন,) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কোন ওলীর সাথে শত্রুতা করল, সে (যেন স্বয়ং) আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধ করার জন্য মাঠে নামল। (তারপর বলেছেন,) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সৎ বান্দাদেরকে বন্ধু হিসাবে গণ্য করেন, যারা পরহেযগার হয়ে থাকে, আত্মগোপন করে থাকে (যাতে সাধারণ মানুষ তাঁদের মর্যাদা বুঝতে না পারে এবং যাতে তাঁদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে না পারে)। যখন তাঁরা অনুপস্থিত থাকেন, তখন যেন তাঁদের অনুসন্ধান না হয় এবং উপস্থিত থাকলে যেন তাদেরকে (অনুষ্ঠানাদিতে) আমন্ত্রণ জানানো না হয় এবং তাদেরকে কাছে টানা না হয়। তাদের অন্তর হেদায়তের প্রদীপ। তারা (অন্তর্দৃষ্টির দরুন এমন) প্রত্যেক বিষয় (ফেৎনা) থেকে বেঁচে থাকেন, যা পঙ্কিলতাপূর্ণ (ও) অন্ধকারাচ্ছন্ন। (ইবনে মাজাহ্; আর বায়হাকী শো'আবুল ঈমান গ্রন্থে)

এ হাদীসে প্রথমে রিয়াকারীর নিন্দা করা হয়েছে এবং রিয়াকারী (তথা লোক দেখানো)-কে শিরক বলে অভিহিত করা হয়েছে। বান্দাকে যে কোন কাজ শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত। যদি মানুষের মাঝে গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, তাদেরকে অনুগত করার জন্য কিংবা তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করার জন্য কোন আমল (কাজ) করা হয় (যেমন নামায পড়ল বা রোযা রাখল অথবা যিকির তেলাওয়াতে সময় ব্যয় করল কিংবা সদকা-খয়রাত বিতরণ করল), তাহলে যদিও দৃশ্যত এগুলো সৎকর্ম বটে; কিন্তু লোক দেখানোর নিয়তের

সৎ থাকে না। যেহেতু এ কাজের বিনিময় (খ্যাতি, সম্মান কিংবা দুনিয়া প্রাপ্তির আকারে) মানুষের কাছ থেকে নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করা হয়, সেহেতু এ কাজটি শিরক হয়ে যায়। দেব-দেবীর পূজা শিরকে আকবর (মহা শিরক) আর রিয়া (লোক দেখানো) হল শিরকে আসগর (ক্ষুদ্র শিরক)। এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ল সে শিরক করল। যে লোক দেখানোর জন্য রোযা রাখল, সে শিরক করল। আর যে লোক দেখানোর জন্য সদকা-খয়রাত করল, সে শিরক করল। (মেশকাত—আহমদ থেকে)

আল্লাহ্ তা'আলা শুধুমাত্র সেসব সৎকর্ম কবূল করেন, যা শুধুমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশে করা হয়। কোন আমল বা কর্ম সম্পর্কে যদি এমন নিয়ত করা হয় যে, আল্লাহ্র কাছ থেকেও সওয়াব নেব, মানুষের মাঝেও খ্যাতি লাভ হবে কিংবা কিছু অর্জন করা যাবে, তাহলে এ ধরনের কর্ম আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাখ্যাত।

এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যখন লোকদেরকে সমবেত করবেন যাতে কোন সন্দেহ নেই, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করে দেবে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য কৃত আমলে অন্য কাউকে শরীক করেছে, সে যেন সে আমলের সওয়াব (সেই) গায়রুল্লাহ্ থেকেই নিয়ে নেয় (যাকে শরীক করেছিল)। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা শরীকানা থেকে যতখানি পরাঙ্মুখ ততখানি পরাঙ্মুখ আর কোন শরীক নেই। (আহমদ)

দ্বিতীয়তঃ হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করল, সে আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধ করার জন্য মাঠে নেমে এল।" এ বক্তব্য অন্য এক হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। তার ভাষা এরূপঃ

مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা করবে, আমি তাকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনাচ্ছি।

"ওলী" অর্থ বন্ধু। সাধারণত প্রত্যেক মুসলমানই নিজ নিজ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলার বন্ধু এবং যে কোন মুসলমানের সাথে শত্রুতা পোষণ করা ধ্বংস ও বিনাশের পূর্বলক্ষণ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার যেসব বিশিষ্ট বান্দা আল্লাহ্র মহব্বতে বিভোর থাকেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্যই বেঁচে থাকেন, আল্লাহ্র জন্যই মৃত্যু বরণ করেন এবং নিজের যাবতীয় অবস্থা ও আচার আচরণে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলির প্রতি লক্ষ্য রাখেন, গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকেন এবং আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে আত্মনিবেদন করেন, এমন লোকদেরকে কষ্ট দেয়া কিংবা তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা দুনিয়া ও আখেরাতের ধ্বংসের শামিল।

আল্লাহ্র বিশিষ্ট বান্দাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা স্বয়ং আল্লাহ্ পাককে নিজের শত্রুতে পরিণত করার তুল্য। সবারই নিজের বন্ধুর খেয়াল থাকে এবং বন্ধুর শত্রুর সাথে শত্রুতা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলাও নিজের বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণকারীদেরকে নিজের প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করেন এবং এ ধরনের লোকদেরকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়ে দেন। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার সাথে যার যুদ্ধ বেঁধে যায়, কোথায় তার ঠিকানা হতে পারে? কাযিউল হাজাত (অভাব মোচণকারী), গাফফার (পাপ ক্ষমাকারী) ও সাত্তার (অপরাধ গোপনকারী) এবং সহায়ক মদদগারই যখন কারও শত্রু হয়ে যান, তখন দুনিয়া ও আখেরাতে তার অভাব কে মোচন করবে? তার জন্য রহমত ও সহায়তার দরজা কোত্থেকে খুলবে? যে লোক মহান আল্লাহ্কে নিজের প্রতিপক্ষ বানিয়ে নিল, সে একক ক্ষমতাধর, সর্বস্রষ্টার সাথে শত্রুতা সৃষ্টি করল, সব কিছুই যার ক্ষমতাভুক্ত, যিনি উপকারী বস্তু-সামগ্রীকেও অপকারী বানিয়ে দিতে পারেন এবং কোন উপকরণ ব্যতীতই অদৃশ্যলোক থেকে আযাবের দরজা খুলে দিতে পারেন! আলেমগণ বলেছেন, শুধু দু'টি পাপই এমন রয়েছে, যার কর্তাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের পবিত্র সত্তার সাথে যুদ্ধকারী সাব্যস্ত করেছেন। এক—যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বন্ধুদের সাথে শত্রুতা করে আর দ্বিতীয় সুদখোর। যেমন, সূরা বাকারায় বলা হয়েছে—

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

অর্থাৎ, অতঃপর যদি তোমরা (সুদ পরিহার) না কর, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (দঃ)-এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।

লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, নিজের বন্ধুজনদের সাথে শত্রুতা পোষণকারীদেরকে আল্লাহ্ পাক এজন্য যুদ্ধের প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করেছেন যে, আল্লাহ্র বিশিষ্ট বান্দারা দুনিয়াদারদের তুলনায় একে তো দুর্বল ও অসহায়, দ্বিতীয়তঃ তাদের মন-মানসিকতায় থাকে ক্ষমাপ্রবণতা। তারা নিজের কঠোরতর শত্রুর কাছ থেকেও প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা করেন না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সততই নিজের সেসব বান্দার সাহায্য-সহায়তা ও পক্ষ অবলম্বন করেন। যার ফলে অনেক সময় এমন হয় যে, কোন নেক বান্দা যদি নিজের শত্রুকে ক্ষমা করে দেন, তখনও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তার উপর গায়েবী মার এসে পড়েছে এবং ধ্বংস ও বিনাশ নেমে এসেছে। ইতিহাস স্বাক্ষী, যখন কোন ব্যক্তি, কোন জাতি কিংবা কোন সরকার আল্লাহ্র কোন বিশিষ্ট বান্দার সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করেছে, তখন তাকে করুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। এ যুগেও অনেকে অহেতুক আল্লাহ্ওয়ালাদের

সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং যাবতীয় ফেৎনা-ফাসাদ ও অনর্থের একক কারণ তাঁদেরকেই সাব্যস্ত করে, যারা কোন না কোনভাবে আল্লাহ্ পাকের সাথে সম্পর্কিত। যেমন, (হয়তো বা তাঁরা) আল্লাহ্র যিকরের ব্যাপারে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে দীক্ষা দান করেন কিংবা তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে খোদায়ী জ্ঞান ও খোদায়ী হুকুম-আহকাম প্রসারে কৃতসংকল্প। হয়তো বা এ ধারার কোন কোন লোকের মাঝে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতিও রয়েছে, কিন্তু যাঁরা আপাদমস্তক এবং জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি দুনিয়াতেই ডুবে থাকে, অন্তত তাদের থেকে তো উত্তম। কোন্ মুখে এসব দুনিয়াদার আল্লাহ্র কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি দোষারোপ করবে এবং নিজেদের আড্ডাকে তাঁদের কুৎসায় ভরে রাখবে!

সুদখোরদেরকেও আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছেন। তার কারণও এই বুঝা যায় যে, সুদখোর নিঃস্ব-দরিদ্র লোকদের অসহায়ত্বের সুযোগে অন্যায় ফায়দা লুটে এবং সুদের মাধ্যমে গরীব ও উদ্বিগ্ন লোকদের মালামাল, অর্থ-সম্পদ, বিষয়সম্পত্তি ও অলঙ্কারাদি হাতিয়ে নেয়। এমন অসহায় ও বিপন্ন লোকদের পক্ষ থেকে সুদখোরদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়ে দেন। যার কেউ নেই তার আল্লাহ্ রয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ হাদীসে সৎ বান্দাদের প্রশংসা করা হয়েছে যে, এরা পরহেযগার হয়ে থাকেন এবং গোপন থাকেন। অর্থাৎ, তাঁরা খ্যাতি কামনা করেন না। তাঁরা নিজেদের কর্মও গোপনে লুকিয়ে রাখেন এবং নিজেদের জাত বংশও গোপন রাখেন। নাম যশের জন্য বা খ্যাতি লাভের উদ্দেশে মঞ্চে আসা, নিজেদের বদান্যতার প্রচার, কর্ম ও অবস্থার প্রদর্শন তাঁদের অভ্যাস নয়।

দুনিয়াদাররা তাঁদেরকে না অনুসন্ধানযোগ্য মনে করে, না নিজেদের আচার-অনুষ্ঠানে তাঁদেরকে শরীক করে। দুনিয়াদাররা তাঁদেরকে যা-ই মনে করুক আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাঁদের বিরাট মর্যাদা রয়েছে। তাঁরা হয়ে থাকেন হেদায়েতের প্রদীপ। নিজেদের ঈমানী বিচক্ষণতার দরুন তাঁরা যাবতীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফেৎনা-ফাসাদ থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যান। جَعَلَنَا اللّٰهُ مِنْهُمْ

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বে মুসলমানদের সাহায্য-সহায়তা না করার অভিশাপ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتِيْبَ عِنْدَهُ اَخُوْهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهِ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَاِنْ لَّمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهِ اَدْرَكَهُ اللّٰهُ بِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ — رواه فى شرح السنة

(১৯) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, যার সামনে তার (কোন) মুসলমান ভাইয়ের গীবত (পশ্চাৎ নিন্দা) করা হল আর ক্ষমতা থাকায় সে তার ভাইয়ের সাহায্য করল (অর্থাৎ, তার পক্ষ থেকে গীবতকারীকে উত্তর দিল এবং তার সাহায্য করল) দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্ তার সাহায্য করবেন। পক্ষান্তরে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বে সাহায্য না করলে সে কারণে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে পাকড়াও করবেন। (শরহুস্সুন্নাহ্)

যে লোক মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করে, তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও সাহায্য আকৃষ্ট হয়। সাহায্যের অনেক রকম পন্থা এবং বহু পরিস্থিতি রয়েছে। এটিও তেমনি একটি পরিস্থিতি হাদীস শরীফে যা উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ, যখন কারো সামনে কোন মুসলমানের গীবত (পশ্চাৎ নিন্দা) করা হয় আর তা প্রতিহত করার সামর্থ্য তার থাকে, তখন অবশ্যই তা প্রতিহত করবে। তা না করলে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পাকড়াও করবেন।

এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে কোন মুসলমান এমন অবস্থায় কোন মুসলমানের সাহায্য পরিহার করবে যাতে তাকে অপমান অপদস্ত করা হচ্ছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এমন জায়গায় তাকেও সাহায্যহীন অবস্থায় ছেড়ে দেবেন যেখানে সে সাহায্যের প্রত্যাশা করবে। পক্ষান্তরে যে মুসলমান এমনি জায়গায় কোন মুসলমানের সাহায্য করবে যাতে তার সম্ভ্রম খর্ব করা হচ্ছে এবং অপদস্ত করা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেক্ষেত্রে তার সাহায্য করবেন, যেখানে সে সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা করবে। (আবু দাঊদ)

হযরত মুআয ইবনে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের সমর্থনে কোন মুনাফেককে উত্তর দেবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা পাঠাবেন, যে তাকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাবে। পক্ষান্তরে যে কোন মুসলমানের প্রতি দোষারোপ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দোযখের পুল (অর্থাৎ পুলসিরাত)-এর উপর আটকে রাখবেন, যতক্ষণ না (আযাব ভোগ করে অথবা যার প্রতি দোষারোপ করেছিল তাকে সন্তুষ্ট করে) নিজের কথা থেকে ফিরে আসবে। (মেশকাত)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। (কাজেই) না একজন অপরজনের প্রতি জুলুম করতে পারে, না ধ্বংস হতে দেখতে পারে। আর যে লোক তার (মুসলমান) ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত হয়, আল্লাহ্ তার সাহায্য করেন। আর যে লোক কোন মুসলমানের উৎকণ্ঠা দূর করে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিনের উৎকণ্ঠা-সমূহের মধ্য থেকে তার একটি উৎকণ্ঠা দূর করে দেবেন। যে লোক কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার দোষ গোপন করবেন। (বুখারী থেকে মেশকাত)

এ হাদীসগুলোকে সামনে রেখে আমাদের নিজেদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা এবং লক্ষ্য করা কর্তব্য যে, আমরা কি প্রয়োজনের সময় মুসলমানদের সাহায্য করে আল্লাহ্‌র রহমতের অধিকারী হচ্ছি, নাকি মুসলমানদেরকে বিপদগ্রস্ত দেখে আনন্দ উপভোগ করছি এবং চক্রান্তের মাধ্যমে তাদের উদ্বিগ্ন করছি।

দুষ্কর্ম অধিক হলে সৎকর্ম থাকা সত্ত্বেও ধ্বংস নেমে আসে

وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْقِصَّةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَفَنُهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ؟ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخُبُثُ — رواه البخارى و مسلم

(২০) উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রাঃ) (কোন ঘটনা বর্ণনা করার পর) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি আমাদের মাঝে সৎ লোকদের থাকা সত্ত্বেও ধ্বংস হয়ে যাব? হুযূরে আকরাম (দঃ) বললেন, হাঁ, যখন দুষ্কর্ম অধিক হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, মানুষের মধ্যে যখন দুষ্কর্ম প্রবল হয়ে যায়, তখন সামান্য কিছু সংখ্যক লোকের সৎকর্ম এবং তাদের অস্তিত্ব সে ধ্বংসকে প্রতিহত করতে পারে না। দুষ্কর্ম অর্থাৎ, অন্যায়-অনাচার ও কবীরা গুনাহের পঙ্কিলতা যখন প্রবল হয়ে যায়, সৎ মানুষ যখন কমই থেকে যায়, তখন ধ্বংস ও বিনাশ নেমে আসবে। তখন সৎ মানুষগুলো বেঁচে থাকবে আর শুধু পাপী-তাপীরাই বিনাশ

হয়ে যাবে তা হবে না; বরং সবার উপরই বিপদ ঘনিয়ে আসবে। যেমন বুখারী ও মুসলিমের এক রেওয়ায়তে আছে—

اِذَا اَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا اَصَابَ الْعَذَابَ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ ثُمَّ بُعِثُوْا عَلٰى اَعْمَالِهِمْ — مشكوة

অর্থাৎ, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতির উপর আযাব নাযিল করেন, তখন তাদের সবাইকে ধ্বংস হতে হয়, যারা তাদের মাঝে থাকে। তারপর নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী সবার হাশর হবে। (মেশকাতঃ ভয় ও ক্রন্দন অধ্যায়)

অর্থাৎ, সাধারণ বিপদে তো সবাই লিপ্ত হবেই, তারপর কিয়ামতের দিন নিজ নিজ নিয়ত এবং নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। বলা হয়েছেঃ

اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَاِنْ شَرًّا فَشَرٌّ

অর্থাৎ, (নিয়ত ও কর্ম) ভাল হলে পরিণতি অবশ্যই ভাল হবে, আর (নিয়ত ও কর্ম) মন্দ হলে পরিণতি অবশ্যই মন্দ হবে।

এতে প্রতীয়মান হল, পাপ ও নাফরমানীসমূহের আধিক্য ব্যাপক আযাব আগমনের বিশেষ কারণ। আর আযাবও যেন-তেন আযাব নয়; বরং এমন আযাব যা সৎ-অসৎ সবাইকেই ধ্বংস করে দেয়।

যাহোক, পাপের পরিণতি অত্যন্ত মন্দ। দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদ-বিড়ম্বনা এবং কষ্ট ও আযাব থেকে অব্যাহতি বা নিরাপত্তা আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী থেকে নিজে বিরত থাকা ও অপরকে বিরত রাখার ভেতরেই নিহিত।

এ পর্যন্ত আমরা সে সমস্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি যাতে বিপদাপদের কারণসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। ২১তম হাদীস থেকে সে সমস্ত হাদীস শুরু হচ্ছে, যেগুলোতে বিপদাপদের প্রতিকার বিবৃত হয়েছে।

নামায ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحْزَبَهٗ اَمْرٌ صَلّٰى

(২১) হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, যখনই কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতেন, তখন নামায পড়তে শুরু করতেন। (মেশকাত)

কোরআন শরীফে এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○ بقرة ايت ١٥٣

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, সাহায্য প্রার্থনা কর ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্যধারণকারীদের সাথে। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৩)

ইসলামী শরীঅতে নামাযের বিরাট মর্যাদা রয়েছে। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সফলতা ফরয ও নফল নামাযের সাথে ভালবাসা পোষণ করার ভেতরে নিহিত রয়েছে। হুযূরে আকরাম (দঃ) যে কোন জটিলতার জন্য নামাযের ব্যবস্থা দিয়েছেন। কোন প্রয়োজন আটকে পড়লে সেজন্য নামায, আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়ার জন্য (অর্থাৎ, এস্তেখারাহ্ করার জন্য) নামায, বৃষ্টি কামনায় নামায, ইসলামের দু'টি উৎসব ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার নামায, সফর আরম্ভ করার পূর্বে দু'রাকআত নামায, সফর থেকে ফিরে এসে দু'রাকআত নামায, চাঁদ ও সূর্যগ্রহণ হলে নামায, কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হয়ে গেলে তখন নামায, ফরয নামাযসমূহ ছাড়া এশরাক ও চাশতের নামায, আওওয়াবীন ও তাহাজ্জুদের নামায, ওযূর পর তাহিয়্যাতুল ওযূর নামায, মসজিদে ঢুকে তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায —এক কথায়, একজন মুসলমানের জন্য শুধু নামাযই নামায ধার্য রয়েছে।

কোরআন শরীফের আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। আর হাদীস শরীফের মাধ্যমে হুযূরে আকরাম (দঃ)-এর কর্মপন্থাও জানা গেল যে, যখনই কোন জটিলতা উপস্থিত হত, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে নামাযে মনোনিবেশ করতেন।

নযর ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন, একবার দিনের বেলায় অন্ধকার ছেয়ে গেলে আমি হযরত আনাস (রাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে জানতে চাইলাম, হুযূর (দঃ)-এর যুগেও কি এমন কোন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল? তিনি উত্তরে বললেন, তখনকার যুগে তো বায়ু সামান্য তীব্র হয়ে গেলেও কিয়ামত চলে আসার ভয়ে আমরা মসজিদের দিকে দৌড়াতে শুরু করতাম। এটি ছিল নবী-যুগের নিত্যদিনের অভ্যাস এবং আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ) কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থাপত্র (যে, বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য এবং নেয়ামতে ভূষিত হওয়ার জন্য নামাযের প্রতি নিবিষ্ট হয়ে যাও)। মহান বিশ্বস্রষ্টা যে ব্যবস্থাপত্র বলে দিয়েছেন, তা যথার্থই সফল। কিন্তু এ ব্যবস্থা মোতাবেক আমল করার লোকের নিতান্ত অভাব; বরং এমন লোক দুষ্প্রাপ্য। আপদ-বালাইর সময় শুধু ফরয নামাযের নিয়মানুবর্তিতাই নয়; বরং ফরযের

সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে নফল নামায আরম্ভ করা এবং বারবার আল্লাহ্র দরবারে নামাযের মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ করা উচিত ছিল, কিন্তু সুঅবস্থা হোক কি দুরবস্থা আমরা ফরয নামাযও ক্রমাগত নষ্ট করতে থাকি; নফলের তো কোন কথাই নেই। তাহলে (আমাদের) বিপদাপদ কেমন করে অপসারিত হবে?

ধৈর্যধারণও বিরাট নেয়ামত। এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ

وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَّاَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ — مشكوة شريف

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সবর (ধৈর্য) অপেক্ষা উত্তম ও ব্যাপক দান কাউকে দেয়া হয় নি। (মেশকাত)

ধৈর্যের মর্যাদা বিরাট। অন্যান্য নেয়ামতগুলো আরাম-আয়েশে কাজে লাগে আর ধৈর্যের নেয়ামত বিপদাপদের সময় সাহায্য করে। সে জন্যই একে অন্যান্য দান অপেক্ষা উত্তম বলা হয়েছে। সওয়াবের আশায় বিপদে ধৈর্য ধারণ করা বিপদ অপসারণের জন্য বিরাট মহৌষধ। এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ

اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرْجِ — مشكوة شريف

অর্থাৎ, সুসময়ের অপেক্ষা করা সর্বোত্তম এবাদত। (মেশকাত)

মু'মিন বান্দা আল্লাহ্র উপর ভরসা করে দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে; হা-হুতাশ করে না। আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করে না। যার ফলে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের দরুন অন্তরে শান্তি ও স্বস্তি বিরাজ করে এবং সহসাই বিপদাপদ অপসারিত হয়ে যায়, এদিক দিয়ে তা নেয়ামতে পরিণত হয়ে যায় এবং বিপদের জন্যও সওয়াব পাওয়া যায়।

যারা বিপদে ঘাবড়ে যায়, হা-হুতাশ শুরু করে দেয় এবং গালাগাল আরম্ভ করে, আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে আপত্তি-অভিযোগ করে, তারা বিপদাপদ থেকে সহসা অব্যাহতিও পায় না এবং তাদের আত্মাও শান্তি-স্বস্তি লাভ করতে পারে না; বরং অনেক লোক (বিপদে) অধৈর্য হয়ে গালাগাল শুরু করে। আল্লাহ্কে মন্দ বলার দরুন তারা কাফের হয়ে যায় এবং ঈমানের সম্পদ হারিয়ে বসে। যে বিপদ এসেছে তা তো এসেই গেছে, নামায ও ধৈর্যের দ্বারা তা অপসারিত হবে, যিকির ও দো'আর মাধ্যমে তা টলে যাবে। ধৈর্যহীনতা ও হা-হুতাশে তা দূর হতে পারে না। তার পরেও বিচলিত ও অধৈর্য হয়ে কি লাভ? (তাই) বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সেজন্য আল্লাহ্ তা'আলার সওয়াবের আশা পোষণ করে বুদ্ধিমান বান্দাগণ বিপদাপদকে মূল্যবান বিষয় বানিয়ে নেয়। পক্ষান্তরে যারা ধৈর্যধারণ করে না

এবং প্রতিদান ও সওয়াবের আশা করে না, তারা বিপদও ভোগ করে তদুপরি সওয়াব থেকেও বঞ্চিত থাকে। বলা হয়েছেঃ

فَاِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابُ

অর্থাৎ, প্রকৃত বিপদগ্রস্ত সে ব্যক্তি যে সওয়াব থেকে বঞ্চিত।

হযরত সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন, মু'মিনের অবস্থা বিস্ময়কর। নিঃসন্দেহে তার প্রত্যেকটি অবস্থাই উত্তম। মু'মিন ছাড়া এমনটি আর কারো ভাগ্যে হয় না। আনন্দ অর্জিত হলে শুকরিয়া আদায় করে। এটি তার জন্য উত্তম। আর কষ্ট হলে সে সবর (ধৈর্যধারণ) করে। এটি (-ও) তার জন্য উত্তম। (মুসলিম)

সবর ও শুকর দু'টি বিরাট বিষয়। এগুলোর মাধ্যমে মু'মিন বান্দারা তাদের দুনিয়া ও আখেরাত গঠন করে এবং আল্লাহ্র অধিকতর রহমত ও নেয়ামতের অধিকারী হতে থাকে।

এশরাক ও চাশ্ত নামাযের জন্য আল্লাহ্র ওয়াদা

وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَاَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهٗ قَالَ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِرْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهٗ — رواه الترمذى

(২২) হযরত আবুদ্দর্দা ও হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেনঃ হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্য দিনের শুরুতে চার রাকআত (নফল) নামায আদায় করে নাও, (তাহলে) আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব। (তিরমিযী)

আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে—যে ব্যক্তি ভোরে (সূর্য কিছুটা উপরে উঠে যাবার পর) চার রাকআত নফল নামায নিষ্ঠার সাথে একান্ত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশে আদায় করবে, দিনের শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা সে লোকের প্রয়োজন ও চাহিদাগুলো পূরণ করতে থাকবেন। এ কল্যাণ এশরাকের সময় চার রাকআত নফল নামায পড়লেও পাওয়া যাবে এবং চাশতের নামায পড়লেও পাওয়া যাবে।

কারণ, উভয় নামাযই দিনের প্রথম ভাগে আদায় করা হয়। কোন কোন বুযুর্গ নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন যে, চাশ্তের নিয়মানুবর্তিতা করলে জীবিকার সঙ্কীর্ণতা আসতে পারে না।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জমাআতে পড়বে এবং অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত (সেখানেই) বসে আল্লাহ্র যিকির-আযকার করতে থাকবে এবং তারপর দু'রাকআত নামায পড়ে নেবে, সে এক হজ্জ এক ওমরার সমান সওয়াব পাবে। অধিক গুরুত্ব আরোপের জন্য কথাটি তিন তিনবার বলা হয়েছে যে, পরিপূর্ণ এক হজ্জ ও এক ওমরার সওয়াব পাবে। (তিরমিযী)

আরও এরশাদ হয়েছে, তোমাদের (দেহের) প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে (শুকরিয়াস্বরূপ) সদকা (করা) কর্তব্য। সুতরাং 'সুবহানাল্লাহ্' সদকা, 'আলহামদু লিল্লাহ্' সদকা, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' সদকা এবং 'আল্লাহু আকবর' সদকা। (অর্থাৎ, এগুলো প্রত্যেকবার পড়া সদকা করার সমান।) সৎকর্মের উপদেশ দান সদকা, অসৎকর্ম থেকে বারণ করা সদকা। আর এসবগুলোর পরিবর্তে চাশ্তের দু'রাকআত পড়ে নেয়া যথেষ্ট হয়ে যায়। (মুসলিম)

দো'আর বিরাট উপকারিতা এবং তার কিছু আদব

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ — رواه الترمذى

(২৩) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, দো'আ আগত বিপদের জন্যও কল্যাণকর এবং অনাগত বিপদের জন্যও (কল্যাণকর)। (কাজেই) হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, অবশ্যই তোমরা দো'আ করবে। (তিরমিযী থেকে মেশকাত)

এর মর্মার্থ হল এই যে, দো'আর দরুন সে বিপদ রহিত হয়ে যায়, যা আসার ছিল এবং যে বিপদ এসে গেছে তা-ও অপসারিত হয়ে যায়। হুযূর (দঃ)-এর ভাষ্য অনুযায়ী দো'আর উপকারিতার ব্যাপারে সন্দেহের আদৌ অবকাশ নেই; কিন্তু একথা জানা থাকা দরকার যে, দো'আ উপকারী হওয়ার জন্য কিছু শর্ত ও আদব রয়েছে, যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। যেমন, (১) হারাম জীবিকা থেকে

মুক্ত থাকা, (২) কোন পাপ কিংবা কেত্য়ে রেহমী (আত্মীয়তা ছিন্নকরণ)-এর দো'আ না করা, (৩) দো'আ কবূল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করা, (৪) দো'আ কবূল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া না করা, (৫) স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে দো'আ করা যাতে সংকীর্ণতার সময়ে দো'আ কবূল হয়, (৬) দো'আর আগে-পরে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করা এবং তাঁর রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করা এবং (৭) এমন দো'আ অবলম্বন করা যা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে প্রভৃতি। প্রচলিত দো'আ অনেক আছে; কিন্তু সবগুলো শরীঅতের নিয়ম অনুযায়ী হয় না।

দো'আ কবূল হওয়ার একটি বড় শর্ত হল নিবিষ্টচিত্তে দো'আ করা। সুতরাং এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দো'আ কর এমন অবস্থায় যে, তা কবূল হওয়ার ব্যাপারে তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে। আর একথাও জেনে রেখো যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা গাফেল ও কৌতুকী অন্তরের দো'আ কবূল করেন না। (তিরমিযী)

অর্থাৎ, দো'আ করার সময় যার অন্তর দো'আর প্রতি নিবিষ্ট থাকে না এদিক সেদিকের কাজে এবং দুনিয়াদারীর ধাঁধায় পরিব্যাস্ত আর মুখে মুখে শুধু রেওয়াজ পূরণ করার জন্য শব্দ উচ্চারণ করতে থাকে, এমন দো'আ কবূলের উপযোগী নয়। বর্তমান যুগের দো'আ প্রার্থীদের অবস্থা ঠিক এমনি। নামাযে যেমন নিবিষ্টতা থাকে না তেমনি দো'আ-প্রার্থনায়ও আত্মোপস্থিতি থাকে না।

আমাদের একটি দুর্বলতা হল এই যে, বিপদাপদের সময় আমাদের দো'আর কথা মনে হয়, আরাম-আয়েশের সময় দো'আর কথা ভুলে যাই। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন, কারো কঠিন সময়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে দো'আ কবূলের আগ্রহ থাকলে আরাম ও আনন্দের সময় তার অধিক পরিমাণে দো'আ করতে থাকা কর্তব্য। (তিরমিযী)

দো'আ বিরাট সম্পদ। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ, দো'আ হল এবাদতের মজ্জাবিশেষ।

আরেক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যাচ্ঞা করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হন।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, যে কোন মুসলমান আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করে যদি তাতে পাপকর্মের কিংবা সম্পর্ক-চ্ছেদের দো'আ না থাকে, তবে আল্লাহ্ তাকে তিনটি বিষয়ের একটি অবশ্যই দান করেন। (১) তার দো'আ কবূল করে নিয়ে অচিরেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে দেবেন, (২) দো'আকে তার জন্য আখেরাতের কল্যাণ বানিয়ে সংরক্ষিত রাখবেন কিংবা

(৩) সে পরিমাণ বিপদ রোধ করবেন (যা তার উপর আসার থাকে)। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, তাহলে তো আমরা প্রচুর পরিমাণে দো'আ করতে থাকব। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উত্তরে বললেন, আল্লাহ্‌র করুণা বিপুল। (মেশকাত— আহমদ থেকে) যত ইচ্ছা চেয়ে নাও, সেখানে কোন কমতি নেই।

সারকথা, হর্ষে-বিষাদে, দুঃখ-কষ্টে, আরাম-আয়েশে, শান্তি-স্বস্তিতে এক কথায় সর্বাবস্থায় সর্বদা অল্প-বিস্তর, সামান্য-বিপুল সবকিছু আল্লাহ্‌র কাছে যাচ্ঞা কর। মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, প্রত্যেকটি চাহিদা নিজের পালনকর্তার কাছেই চাও এমন কি জুতার ফিতা ছিড়ে গেলে তা-ও আল্লাহ্‌র কাছেই যাচ্ঞা কর। আরেক রেওয়ায়তে আছে, লবণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কাছে চাও। (তিরমিযী থেকে মেশকাত)

শুকরিয়ায় নেয়ামত বৃদ্ধি পায় আর নাশুকরীতে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ —— رواه الترمذى وابن ماجة

(২৪) হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন, যিকিরের মধ্যে সর্বোত্তম যিকির হল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" আর দো'আর মধ্যে সর্বোত্তম দো'আ হল "আলহামদু লিল্লাহ্"। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্)

পবিত্র এ হাদীসে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"-কে সর্বোত্তম যিকির আর "আলহামদু লিল্লাহ্"কে অন্যান্য দো'আ অপেক্ষা উত্তম বলা হয়েছে। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" অন্যান্য যিকির অপেক্ষা উত্তম এজন্য যে, এটি ইসলামের মৌলিক আকীদার মুখপাত্র। ঈমান না থাকলে কোন যিকির-আযকার, ওযীফা-এবাদতই কবূল হয় না। সুতরাং যে কলেমার মাধ্যমে ঈমান ঘোষিত ও প্রকাশিত হয় তা উত্তম হওয়াই উচিত।

হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিবেদন করলেন, আয় পরওয়ারদেগার! আমাকে এমন কোন কিছু শিখিয়ে দিন যার মাধ্যমে আপনাকে স্মরণ করব, আপনাকে ডাকব। আল্লাহ্ বললেন, হে মূসা! "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বল। মূসা (আঃ) নিবেদন করলেন, হে পরওয়ারদেগার, সব বান্দাই তো এটি বলে;

আমি তো এমন কোন বিষয় প্রার্থনা করছি যা আমাকে আপনি বিশেষভাবে দান করবেন। আল্লাহ্ পাক বললেন, হে মূসা (এ কলেমাকে মামুলী মনে করো না) যদি সাত আসমান ও আমাকে ছাড়া তন্মধ্যস্থিত সবকিছু এবং সাত (তবক) যমীন এক পাল্লায় রাখা হয়, আর অপর পাল্লায় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" রাখা হয়, তাহলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" সে সবগুলোর চাইতে বেড়ে যাবে। (শরহুস্সুন্নাহ)

আরেকটি কথা বলা হয়েছে যে, "আলহামদু লিল্লাহ্" অন্যান্য দো'আ-প্রার্থনা-সমূহ অপেক্ষা উত্তম। আলহামদু লিল্লাহ্ অর্থ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত"। বান্দাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার দয়া-করুণা অসংখ্য। ঈমানদার বান্দাগণ আল্লাহ্র নেয়ামত তথা আশীর্বাদসমূহ স্মরণ করে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় "আলহামদু লিল্লাহ্" বলে উঠেন। যে লোক আল্লাহ্র শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অধিকতর নেয়ামতে ধন্য করে দেন। পক্ষান্তরে নাশুকরী (অকৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করলে তাকে আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করেন। যেমন, সূরা ইবরাহীমে এরশাদ হয়েছে—

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَـرْتُمْ لَاَزِيْـدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَـرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ○ ابراهيم ايت ٧

অর্থাৎ, আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে অধিকতর (নেয়ামত) দান করব। আর যদি তোমরা নাশুকরী কর তাহলে (মনে রেখো,) আমার আযাব (হবে) অত্যন্ত কঠিন। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৭)

সুতরাং শুকরিয়া আদায় করাতে যখন নেয়ামত বৃদ্ধি পায় আর "আলহামদু লিল্লাহ্" যখন শুকরিয়া প্রকাশক বাক্য, তখন এ বাক্যটি উচ্চারণ করলে অধিক নেয়ামত কামনা হয়ে যায়। কাজেই এ বাক্যের দ্বারা একই সঙ্গে শুকরিয়াও আদায় হয়ে যায় এবং নেয়ামত কামনাও হয়ে যায়। কাজেই "আলহামদু লিল্লাহ্" হল সর্বোত্তম দো'আ।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ مَاشَكَرَ اللهَ عَبْدٌ لَايَحْمَدُهٗ

অর্থাৎ, "আলহামদু" হল কৃতজ্ঞতার শীর্ষ বিষয়। যে বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করে না, সে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। (মেশকাত)

উপরে যে আয়াতখানি উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, শুকরিয়া হল নেয়ামত বৃদ্ধির কারণ আর নাশুকরীর কারণে নেয়ামত

বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তফসীরে ইবনে কাসীরে اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ (নিশ্চয়ই আমার আযাব কঠোর) বাক্যের তফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

وَذٰلِكَ يَسْلُبُهَا عَنْهُمْ وَعِقَابَهٗ اِيَّاهُمْ عَلٰى كُفْرِهَا

অর্থাৎ, (নেয়ামতসমূহের নাশুকরীর দরুন যে কঠিন আযাবের কথা শোনানো হয়েছে, তা এভাবে প্রকাশ পায় যে,) তাদের কাছ থেকে নেয়ামতসমূহ ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং নাশুকরীর দরুন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দান করেন।

'সাবা' নামক দেশের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বিপুল নেয়ামতে ভূষিত করেছিলেন। তারা নাশুকরী করলে তা ছিনিয়ে নেয়া হয়। এ ঘটনারই বিস্তারিত বিবরণ কোরআন শরীফে সূরা সাবার দ্বিতীয় রুকূতে বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে—

لَقَـدْ كَانَ لِسَبَـاٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَـةٌ ج جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّ شِمَالٍ ۵ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّـكُـمْ وَاشْـكُـرُوْا لَهٗ ط بَلْدَةٌ طَيِّبَـةٌ وَّرَبٌّ غَفُـوْرٌ ○ فَاَعْـرَضُـوْا فَاَرْسَلْنَـا عَلَيْهِمْ سَيْـلَ الْعَـرِمِ وَبَـدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُـلٍ خَمْـطٍ ط وَّاَثْـلٍ وَّشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ○ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ط وَهَلْ نُجْزِىْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ○ سبا ايت ١٥-١٧

অর্থাৎ, সাবাবাসীদের জন্য তাদের স্বদেশেই বিদ্যমান ছিল নিদর্শন। উদ্যানের দু'টি সারি ছিল ডানে ও বাঁয়ে। (বলা হয়েছিল,) খাও (ভোগ কর) তোমাদের পালনকর্তার দেয়া রুযী থেকে আর তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে থাক। (এটি বসবাসের জন্য) উত্তম শহর আর পালনকর্তা ক্ষমাশীল। বস্তুত ওরা বিমুখতা অবলম্বন করল। তখন আমি তাদের উপর বাঁধের সয়লাব তথা বাঁধ ভাঙ্গা প্লাবন ছেড়ে দিলাম এবং আমি তাদের দু'সারি উদ্যানের পরিবর্তে অন্য দু'টি বাগান দিয়ে দিলাম যাতে এসব বস্তু-সামগ্রী থাকল—বিস্বাদ ফল, ঝাউ এবং সামান্য কুল। আমি তাদেরকে এসব শাস্তি দিয়েছি তাদের নাশুকরীর কারণে। তাছাড়া নাশুকরদেরকেই আমি এ ধরনের শাস্তি দিয়ে থাকি। (সূরা সাবা, আয়াত ১৫—১৭)

সাবা দেশের কোন রাজা বর্ষার পানি প্রতিহত করার জন্য একটি বিশাল ও সুদৃঢ় বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। তাতে দূরদূরান্তের পানি এসে জমা হত। তা থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল ও নদী টেনে নিয়ে তদ্দ্বারা সারা বছর ধরে ক্ষেতখামার ও বাগ-বাগিচা সেচ করা হত আর সেসব বাগ-বাগিচা সড়কের দু'ধার ধরে মাইলের পর মাইল

চলে গিয়েছিল। তাদের জনপদগুলো এমনি কাছাকাছি অবস্থিত ছিল যে, কোন মুসাফির যখন ইচ্ছে যে কোনখানে যাতায়াত করতে পারত এবং সর্বত্র পানাহার সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারত। বসতির সংলগ্নতার দরুন সর্বপ্রকার শান্তি-নিরাপত্তাও বিদ্যমান ছিল। আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত নির্মল। কিন্তু সেখানকার লোকেরা যখন (এতসব প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি সত্ত্বেও) শুকরিয়ার পরিবর্তে নাশুকরী ও পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়ে উঠল, তখন প্রতিশোধের সময় এসে উপস্থিত হল। অর্থাৎ, সে বাঁধটি ভেঙ্গে গেল। কোন কোন রেওয়ায়তে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সে বাঁধের উপর ছুঁচো চাপিয়ে দিলেন এবং ওরা তাতে ছিদ্র করে দিল যা পরে প্রশস্ত হতে হতে সমস্ত বাগ-বাগিচা ও জনপদকে জলমগ্ন করে দিল। তারপর যখন বন্যার পানি শুকাল, তখন সেসব বাগ -বাগিচার জায়গায় রয়ে গেল কিছু আগাছার জঙ্গল। আর সারা দেশবাসীর কিছু গেল ধ্বংস হয়ে আর কিছু উদ্বেগাকুল হয়ে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

তফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে যে, সাবাবাসীর বাগানগুলোর অবস্থা ছিল এমন যে, কোন মহিলা ফল সংগ্রহের উদ্দেশে নিজের মাথায় ঝাঁকা অথবা ঝোলা নিয়ে গাছের নীচ দিয়ে চলতে থাকলেই তার ঝাঁকা ফলে ভরে যেত। অর্থাৎ, ফলের প্রাচুর্য ও পরিপক্কতার দরুন নিজে নিজেই ঝরে পড়তে থাকত; লাঠি বা ঢিল ছুঁড়ে পাড়ার প্রয়োজন হতো না। তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার আরেক মহাদান ছিল এটা যে, তাদের জনপদগুলোতে মশা-মাছি ও অন্যান্য কোন কীট-পতঙ্গ ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি মেহেরবানী করেছিলেন, যাতে তারা একত্ববাদী বান্দা হয়ে যায় এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত-উপাসনায় আত্ম-নিয়োগ করে। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, নিজেদের পালনকর্তা প্রদত্ত রিযিক খাও এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাক। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কৃতঘ্নতায় মেতে উঠল। ফলে সেসব নেয়ামত তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হল। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন— وَهَلْ نُجٰزِىٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ "কেবল অকৃতজ্ঞদেরকেই আমি এরূপ শাস্তি দিয়ে থাকি।"

সূরা নাহ্‌লেও আল্লাহ্ তা'আলা এক জনপদের নাশুকরী ও তার পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে—

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللهِ فَاَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○ نحل ایت ۱۱۲

অর্থাৎ, আর আল্লাহ্ তা'আলা এক জনপদের অধিবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, তারা অত্যন্ত সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করছিল। সবখান থেকেই তাদের জীবিকা নির্বাহ হত নিতান্ত সচ্ছলতার সাথে। কিন্তু তারা আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতরাজির নাশুকরী করল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ভীতির স্বাদ চাখিয়ে দিলেন। (সূরা নহল, আয়াত ১১২)

তফসীরবিদগণ বলেন, এ আয়াতে মক্কাবাসীদের কথা বলা হয়েছে। মক্কাবাসীর প্রতি সবসময়ই আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম করুণা ও আশীর্বাদ ছিল। এরা অত্যন্ত আরাম-আয়েশের ভেতরে ছিল। বছরে দু'বার বাণিজ্য সফরে যেত আর খাবার দাবার এবং জীবনযাপনের উৎকৃষ্ট বস্তু-সামগ্রী এখানকার অধিবাসীরা পেয়ে যেত। খানা-কা'বার যেয়ারতের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন আসত এবং নিজেদের সাথে বয়ে আনা নানা রকম নেয়ামতসামগ্রী ছেড়ে যেত। কা'বা শরীফের সম্মান ও পবিত্রতার কারণে কোন গোত্র-গোষ্ঠী মক্কাবাসীর উপর আক্রমণ করত না। এসব কারণে মক্কাবাসী নিতান্ত নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করত এবং সচ্ছল-ভাবে প্রচুর পানাহার করত। কিন্তু আরবরা যেহেতু দ্বীনে ইবরাহীমী [হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রবর্তিত ধর্ম] পরিত্যাগ করে কুফরী ও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, তাই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন শেষ যমানার নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠালেন। তিনি সমগ্র বিশ্ব মানবের নবী। যেমন কোরআনে ঘোষণা রয়েছে। তিনি তার নবুওতী কর্মের সূচনা করেন নিজের মাতৃভূমি মক্কা মুআয্যমা থেকে। মক্কাবাসীর কর্তব্য ছিল আল্লাহ্‌র একত্ববাদ স্বীকার করা এবং তাঁর মহান নবী (দঃ)-এর আনুগত্য অবলম্বন করা; কিন্তু তারা অমান্য করেছে। আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে এবং তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতরাজির প্রতি এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করে নি; কুফরী ও কৃতঘ্নতাকে নিজেদের প্রিয় রীতি সাব্যস্ত করে নিয়েছে। যার ফলে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম মাতৃভূমি মক্কা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন এবং মদীনা মুনাওওয়ারাকে নিজেদের হিজরতাবাস বানাতে হয়েছে। মক্কার কাফেররা তাতেও তাঁদের পিছু ছাড়ে নি; সেখানে গিয়েও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। মহানবী (দঃ) অতীষ্ট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষের বদ-দো'আ করেন। ফলে মক্কায় এমন আকাল পড়ে যায় যে, সেখানকার অধিবাসীদেরকে কঠিনতর ক্ষুধা ও দারিদ্র্য পোহাতে হয়। তাদের কাছে খাবার বলতে কোন কিছুই ছিল না। আকাল সব কিছুই কেড়ে নিয়েছিল। তখন তারা উটের লোম, চামড়া এবং হাড়গোড় পর্যন্ত খেয়েছে। কুফরী ও নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার দরুনই এ বিপদ নেমে এসেছিল।

فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○ نحل آيت ١١٢

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ভীতির মজা চাখিয়ে দিলেন। (সূরা নহল, আয়াত ১১২)

সারকথা, আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতের নাশুকরী নেয়ামত শেষ করে দেয় এবং জীবন পরিস্থিতি নিকৃষ্টতর বানিয়ে দেয়। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ও জাতির সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে শুকরগুযার (কৃতজ্ঞ) বান্দাদের সম্পদ বৃদ্ধি ও উন্নতি হতে থাকে।

শুকরিয়া ও নাশুকরীর তাৎপর্য সম্পর্কে মুসলিম মনীষীবৃন্দের বিশ্লেষণে শব্দের পার্থক্য থাকলেও অর্থের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরে لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

اَىْ اِذَا اَقَمْتُمْ بِمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهُ مِنْ طَاعَتِهٖ بِاَدَاءِ فَرَائِضِهٖ وَتَرْكِ مَحَارِمِهٖ وَحِفْظِ حُدُوْدِهٖ فَلَعَلَّكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا مِنَ الشَّاكِرِيْنَ بِذٰلِكَ

অর্থাৎ, (মানুষ) যখন আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করে অর্থাৎ তার নির্ধারিত ফরযগুলো আদায় করে, হারামকৃত বিষয়গুলো পরিহার করে এবং তাঁর নির্ধারিত বাধ্যবাধকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্দেশাবলী পালন করবে, তখন এভাবেই তারা শুকরগুযারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (রোযা সংক্রান্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে)

তেমনি বিজ্ঞ তফসীরকার وَكَانَ الْاِنْسَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا -এর তফসীর প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

اَىْ جُحُوْدًا لِاَنَّهٗ اَنْكَرَ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِطَاعَتِهٖ بَلْ اَقْبَلَ عَلٰى مَعْصِيَتِهٖ وَمُخَالَفَتِهٖ

অর্থাৎ, মানুষ নেয়ামতসমূহের অস্বীকারকারী বটে। কারণ, তারা আল্লাহ্র নেয়ামতকেই অস্বীকার করে, আল্লাহ্র আনুগত্য করে না ; বরং তাঁর নাফরমানী ও বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করে। (সূরা বনী ইসরাঈলের ৩য় রুকূর তফসীর প্রসঙ্গে)

হযরত ইমাম গায্যালী (রঃ) মিনহাজুল আবেদীন গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

وَاَمَّا الشُّكْرُ فَتَكَلَّمُوْا فِىْ مَعْنَاهُ وَاَكْثَرُوْا فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اَلشُّكْرُ هُوَ الطَّاعَةُ بِجَمِيْعِ الْجَوَارِحِ لِرَبِّ الْخَلَائِقِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَاِلٰى نَحْوِهٖ ذَهَبَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا فَقَالَ اَلشُّكْرُ هُوَ اَدَاءُ

الطَّاعَاتِ فِى الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى اَنَّهٗ اجْتِنَابُ الْمَعَاصِىْ ظَاهِرًا وَّبَاطِنًا (الى ان قال) اِنْ اَقَلَّ مَايَسْتَوْجِبُهُ الْمُنْعِمُ بِنِعْمَةٍ اَنْ لَّايَتَوَصَّلَ بِهَا اِلٰى مَعْصِيَةٍ وَمَا اَقْبَحُ حَالُ مَنْ جَعَلَ نِعْمَةُ الْمُنْعِمِ سِلَاحًا عَلٰى عِصْيَانِهٖ

অর্থাৎ, মুসলিম ওলামায়ে কেরাম শুকরিয়ার অর্থ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রকাশ্যে ও গোপনে যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য করাই হল শুকরগুযারী। আমাদের কোন কোন মনীষী শুকরিয়ার প্রায় এরূপ অর্থই বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, প্রকাশ্যে ও গোপনে বন্দেগী আদায় করার নাম শুকরিয়া। তারপর তারা অন্যভাবেও শুকরিয়ার অর্থ করেছেন যে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সব রকম পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে হবে। [আলোচনার ধারা অব্যাহত রেখে ইমাম গায্যালী (রঃ) বলেন,] এ তো হলো ন্যূনতম পর্যায় যে, নেয়ামতদাতার নেয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতার অবলম্বন না বানানো। এমন লোকের দুরবস্থার জন্য আফসোস, যে নেয়ামতকে নেয়ামতদাতার অবাধ্যতার হাতিয়ার বানায়।

এ সমুদয় বিশ্লেষণ থেকে জানা গেল, আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া স্বাস্থ্য, সম্পদ, সম্মান, উত্থান, খ্যাতি, মহত্ত্ব, মর্যাদা ও পদকে মহান আল্লাহ্র এবাদত উপাসনার উপায় বানিয়ে নেয়াই হল শুকরিয়ার তাৎপর্য। আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহ ভোগ করত তাঁর ফরযগুলোকে বিনষ্ট করা হল নাশুকরী ও সৌজন্যহীনতা। যিনি নেয়ামত দান করেছেন বিশেষত তাঁরই নেয়ামতকে তাঁরই অবাধ্যতায় ব্যয় করা ও নিয়োগ করা নিকৃষ্টতর নাশুকরী।

এযুগের লোকেরা শুধু মুখে মুখেই "আলহামদু লিল্লাহ্" বলে নেয়াকে অথবা অন্য কথায় শুকরিয়ার শব্দ জপ করে নেয়াকেই শুকরিয়া আদায় করা মনে করে। "আলহামদু লিল্লাহ্"-এর হাজার তসবীহ জপ করলেও দাড়ি কামিয়ে যাচ্ছে, নামায নষ্ট করছে, যাকাত বন্ধ করে রাখছে, বহু বছর যাবৎ হজ্জ ফরয হয়ে আছে, কিন্তু দুনিয়াদারীর ধান্দায় বায়তুল্লাহ্ শরীফ যেয়ারতের ইচ্ছা করছে না, রমযানের পবিত্র মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তথাপি যুব শ্রেণী বিড়ি-সিগারেটের নেশায় মজে থাকে এবং আল্লাহ্ বিস্মৃত লোকেরা রমযানেও অন্য এগার মাসেরই মত বরাবর পানাহার করতে থাকে, আল্লাহ্ প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে ছবি ও গানবাদ্যের উপকরণ কিনছে, সিনেমা দেখছে। হারাম পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরিতে, জুয়া খেলায়, সুদের

লেনদেনে, ঘুষের বাজার গরম করতে, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের আবেদন হস্তগত করতে এবং এমনি ধরনের অসংখ্য পাপকর্মে ব্যয় করা হচ্ছে। দেহ এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (চোখ, নাক, কান, হৃদয়, মস্তিষ্ক, হাত ও পা প্রভৃতি) আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত। এসবের মাধ্যমে ক্রমাগত পাপকর্ম সম্পাদন করতে থাকে। এ ধরনের কৃতঘ্ন মানুষের উপর নেয়ামত বর্ষণ কেমন করে হবে? কেমন করেই বা এ ধরনের মানুষ উত্তম জীবনের অধিকারী হতে পারে? বিভিন্ন বিপদাপদের মাধ্যমে যে নেয়ামতরাজি ছিনিয়ে নেয়া হয়, তা নাশুকরীরই পরিণতি। বিপদাপদ ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা যে আশীর্বাদ ও করুণা দান করে থাকেন, তা একান্তই তাঁর অনুগ্রহ।

কোরআন তেলাওয়াতের বরকত

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِىْ وَمَسْئَلَتِىْ اَعْطَيْتُهٗ اَفْضَلَ مَااُعْطِى السَّائِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهٖ

—— رواه الترمذى والدارمى والبيهقى فى شعب الايمان

(২৫) হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, মহান পরওয়ারদেগারে আলম বলেনঃ কোরআন (অধ্যয়নের ব্যস্ততা) যাকে আমার (নফল) যিকির এবং আমার নিকট প্রার্থনা করার অবসর দেয় নি, আমি নিজে তাকে তদপেক্ষা উত্তম (বিষয়) দান করব যা দান করব প্রার্থনাকারী-দেরকে। আর আল্লাহ্‌র কালামের ফযীলত বাকী কালামের উপর তেমনি, যেমন আল্লাহ্‌র ফযীলত তাঁর সৃষ্টির উপর। (তিরমিযী ও দারেমী। আর শো'আবুল ঈমানে বায়হাকী)

এর মর্মার্থ এই যে, যে ব্যক্তি এত বেশী কোরআন তেলাওয়াত করে, যাতে দো'আ-প্রার্থনা ও যিক্‌র-ওযীফার জন্য অবসর পায় না, এমন লোকের ব্যাপারে একথা মনে করা উচিত নয় যে, সে দো'আ-প্রার্থনা করে নি বলে বঞ্চিত থেকে যাবে। কোরআনের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এত কিছু দান করবেন, যা প্রার্থনাকারীদের আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা উত্তম হবে। এতে প্রতীয়মান হল, আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও সাহায্য আহরণের জন্য কোরআন তেলাওয়াতে নিয়োজিত থাকা দো'আ-প্রার্থনা অপেক্ষাও অধিক সফলতা দানকারী হয়।

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَءَ يٰسٓ فِىْ صَدْرِ النَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَائِجُهٗ —— رواه الدارمى مرسلا

(২৬) হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ্ (রহঃ) বলেন, হুযূর (দঃ)-এর এ হাদীসটি আমার কাছে পৌঁছেছে যে, যে ব্যক্তি ভোরবেলা সূরা ইয়াসীন পড়ে নেবে, তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাবে। (দারেমী)

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا وَكَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَأْمُرُ بَنَاتَهٗ يَقْرَأْنَ بِهَا فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ —— رواه البيهقى فى شعب الايمان

(২৭) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকেয়া পড়ে নেবে সে কখনও ক্ষুধার্ত থাকবে না। (হাদীসটির রেওয়ায়তকারী) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁর কন্যাদেরকে নির্দেশ দিতেন, যাতে তারা প্রতিদিন রাতের বেলায় সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করেন। (শো'আবুল ঈমানে বায়হাকী)

কোন কোন রেওয়ায়তে আছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) অত্যন্ত প্রত্যয়ের সাথে বলতেন যে, আমার ঘরে ক্ষুধা কেমন করে আসতে পারে, যখন আমার কন্যারা সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করে থাকে!

এক হাদীসে সূরা ওয়াকেয়াকে সূরা 'গেনা' (সমৃদ্ধি) বলা হয়েছে।

(কানযুল ওম্মাল)

কোরআন শরীফের অসংখ্য বরকত রয়েছে। এর তেলাওয়াত এবং তার প্রতিদান ও সুফল দুনিয়া ও আখেরাতে বিপুল। যার সময় কোরআনের শিক্ষা অর্জন শিক্ষাদান ও তেলাওয়াতে অতিবাহিত হয়, সে অত্যন্ত বরকতময় ও পুণ্যবান।

সাইয়্যেদুল বাশার (দঃ) এরশাদ করেছেন, (কিয়ামতের দিন) কোরআনওয়ালা-দেরকে বলা হবে, পড়ে যাও এবং (সুউচ্চ ধাপে) আরোহণ করতে থাক। আর তেমনিভাবে থেমে থেমে পাঠ কর, যেমন করে দুনিয়াতে পাঠ করতে। কারণ, ওখানেই তোমার মঞ্জিল (ঠিকানা) যেখানে তুমি শেষ আয়াতটি পাঠ করবে।

(আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে আহমদ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যার ভেতরে সামান্যতম কোরআনও নেই সে পতিত বা উজাড় বাড়ির মত। (মেশকাত)

এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক আল্লাহ্র কিতাব থেকে একটি বর্ণ পাঠ করবে, সে এক বর্ণ পাঠের বিনিময়ে তার জন্য একটি নেকী (কল্যাণ) রয়েছে। আর প্রত্যেকটি নেকীকে (অন্তত) দশগুণ করে দেয়া হয়। (তারপর বলেছেন,) আমি বলি না যে, (আলিফ-লাম-মীম) একটি বর্ণ; (বরং) আলিফ একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম আর একটি বর্ণ।

(ইবনে মাসউদ থেকে তিরমিযী)

মহানবী (দঃ) আরও বলেছেন, যে লোক কোরআন পড়ল এবং সে অনুযায়ী আমল করল, তার মাতাপিতাকে কিয়ামতের দিন এমন মুকুট পরানো হবে যার আলো সূর্যের (সে সময়কার) আলো অপেক্ষা (-ও) উত্তম হবে, যখন সেটি তোমাদের বাড়ি-ঘরে থাকে। সুতরাং সে লোকের ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কি যে স্বয়ং এই আমল করেছে (অর্থাৎ, মাতাপিতাই যখন এমন পুরস্কারে ভূষিত হবে, তখন আমলকারী কি পরিমাণ পেতে পারে তা ভাল করে ভেবে দেখ)?

[মুআয জুহানী (রাঃ) থেকে আহমদ]

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, সরওয়ারে কায়েনাত (দঃ) এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বস্তুরই একটা অন্তর রয়েছে। আর কোরআনের অন্তর হল (সূরা) ইয়াসীন। যে ব্যক্তি (একবার সূরা) ইয়াসীন পাঠ করবে তা পাঠ করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দশবার কোরআন পাঠের সওয়াব লিখে দেবেন। (তিরমিযী)

এক হাদীসে আছে, মহানবী (দঃ) বলেছেন, যে লোক আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তার অতীত (সগীরা) গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। কাজেই এই সূরা মরনোন্মুখ লোকের কাছে (প্রাণ বের হবার সময়) পড়। (শো'আবুল ঈমানে বায়হাকী)

আরেক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক শুক্রবার দিন সূরা কাহ্ফ পড়ে নেয়, উভয় শুক্রবারের মাঝে তার জন্য নূর আলোকিত থাকবে। [অর্থাৎ, তার অন্তর জ্যোতির্ময় থাকবে।] (দা'ওয়াতুল কবীরে বায়হাকী)

এক হাদীসে আছে, যে লোক জুমুআর দিন সূরা আলে ইমরান পাঠ করবে, রাতের আগমন পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দো'আ পাঠাতে থাকবেন।

(দারেমী)

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, জুমুআর দিন তোমরা সূরা হূদ পাঠ কর। (দারেমী)

হযরত আবদুল মালেক ইবনে ওমাইর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন, ফাতেহাতুল কিতাবে (অর্থাৎ সূরা ফাতেহায়) সর্বরোগের শেফা (মুক্তি) রয়েছে। (দারেমী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, 'সূরা ইযা যুলযিলাহ্' অর্ধেক কোরআনের সমান, 'সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান আর 'সূরা কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। (তিরমিযী)

আরেক হাদীসে আছে, 'সূরা আলহাকুমুত্তাকাসুর' পড়া হাজার আয়াত পড়ার সমান। (শো'আবুল ঈমানে বায়হাকী)

অন্য আরেক হাদীসে আছে, 'সূরা ইযা জাআ নাসরুল্লাহ্' কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান।

এক হাদীসে আছে, 'সূরা ফাত্হ' সে সমস্ত কিছুর চাইতে আমার প্রিয় যেসব বস্তু-সামগ্রীর উপর সূর্যোদয় হয়েছে। (হিস্নে হাসীন)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে কোরআনে একটি সূরা রয়েছে যাতে ত্রিশটি আয়াত আছে— এক ব্যক্তির জন্য সেটি (সে সূরাটি) এতটুকু সুফারিশ করল যাতে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হল। তা হল 'সূরা তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক।' (মেশকাত)

আরেক হাদীসে আছে, এই সূরা (মুলক) কবরের আযাব থেকে মুক্তিদাতা। আর 'সূরা আলিফ লাম মীম সজদা' সম্পর্কেও এ মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (দঃ) এ (সূরা) দু'টি না পড়ে (রাতের বেলা) ঘুমাতেন না। (মেশকাত)

মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াত শুনে, তার জন্য দু'টি নেকীর বিষয় লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করে, কিয়ামতের দিন তার জন্য সে আয়াতটি নূরে পরিণত হবে। [আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে আহমদ]

আল্লাহ্র যিকির দ্বারা অন্তরে শান্তি লাভ হয় এবং আযাব থেকে মুক্তি ঘটে

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ لِكُلِّ شَىْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللهِ وَمَامِنْ شَىْءٍ اَنْجٰى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ قَالُوْا وَلَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ؟ قَالَ وَلَا اَنْ يَّضْرِبَ بِسَيْفِهٖ حَتّٰى يَنْقَطِعَ — رواه البيهقى فى الدعوات الكبير

(২৮) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলতেন, প্রত্যেক বস্তুর জন্য একটি পরিমার্জক রয়েছে, আর অন্তরের পরিমার্জক হল আল্লাহ্র যিকির। আর আল্লাহ্র আযাব থেকে যিকরুল্লাহ্ অপেক্ষা উত্তম মুক্তিদানকারী অন্য কোন বিষয় নেই। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করাও কি যিকরুল্লাহ্ অপেক্ষা বড় নয়? বললেন, না, (জেহাদও আল্লাহ্র যিকির অপেক্ষা বড় নয়) যদি মারতে মারতে মুজাহেদের তলোয়ার ভেঙ্গেও যায়। (দা'ওয়াতুল কবীরে বায়হাকী)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, দুনিয়া ও আখেরাতের আযাব থেকে মুক্তি দানের ক্ষেত্রে সমস্ত আমল অপেক্ষা অধিক দখল রয়েছে আল্লাহ্র যিকিরের। আল্লাহ্র কালাম তেলাওয়াত, আলহামদু লিল্লাহ্, আল্লাহু আকবর, সুবহানাল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ প্রভৃতি সবই আল্লাহ্র যিকির। এসবের মাধ্যমে পেরেশানী (উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা) দূর হয়।

আল্লাহ্র যিকির দ্বারা আত্মার প্রশান্তি অর্জিত হয়। কোরআন শরীফে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থাৎ, জেনে রাখ, আল্লাহ্র যিকির দ্বারা আত্মার প্রশান্তি অর্জিত হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, যারা কোন জায়গায় বসে আল্লাহ্র যিকির করে, তাদেরকে ফেরেশতাগণ পরিবেষ্টিত

করে নেন, তাদের উপর রহমত ছেয়ে যায়, প্রশান্তি নেমে আসে এবং আল্লাহ্ তাদের কথা নিজের দরবারীদের মাঝে আলোচনা করেন। (মুসলিম)

এক হাদীসে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দাদের ধারণার সাথে রয়েছি (অর্থাৎ, তারা আমার প্রতি যে ধারণা পোষণ করে, সে অনুযায়ী আমি তাদের আশা আকাঙ্খা পূরণ করে দেই।) এবং আমি আমার বান্দাদের সাথে থাকি যখন তারা আমাকে স্মরণ করে। সুতরাং যখন তারা নিজেদের অন্তরে আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তাদেরকে নিভৃতে স্মরণ করি। যদি তারা সমাবেশে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাদেরকে এমন সমাবেশে স্মরণ করি যা সে সমাবেশ অপেক্ষা উত্তম যাতে সে আমাকে স্মরণ করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, প্রত্যেকটি লোকের প্রত্যেকটি কথা তার জন্য বিপদস্বরূপ; লাভজনক বিষয় নয়। তবে 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার এবং আল্লাহ্র যিকর' (হলে আলাদা কথা)। (তিরমিযী)

এক লোক নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইসলামের বিষয় তো অনেক রয়েছে, (সেগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য আমার উপরও অনেক,) সব দায়-দায়িত্ব সম্পাদনে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যাওয়া সম্ভব। সুতরাং আপনি আমাকে এমন কোন বিশেষ বিষয় বাতলে দিন যা আমি আমার গাঁটে বেঁধে নিতে পারি। (অর্থাৎ, বেশীর ভাগ তাতেই লেগে থাকতে পারি এবং বেশীর চাইতে বেশী সওয়াব অর্জন করতে পারি।) উত্তরে হুযূর (দঃ) বললেন, সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণে তোমার জবান সিক্ত রেখো। (তিরমিযী)

এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, শয়তান মানুষের অন্তরের উপর দৃঢ়ভাবে অধিকার জমিয়ে রেখেছে। কাজেই যখন মানুষ আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তখন শয়তান সরে যায় এবং যখন স্মরণ থেকে শিথিল হয়ে পড়ে, তখন শয়তান (পুনরায়) ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) দিতে শুরু করে। (মেশকাত)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি আমিঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

সুবহানাল্লাহ্, ওয়াল হামদু লিল্লাহ্, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবর বলি, তাহলে এটি আমার জন্য সে সমুদয় বিষয় অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যেগুলোর উপর সূর্যোদয় হয়েছে। (মুসলিম)

আরেক হাদীসে আছে, দু'টি বাক্য মুখের জন্য হালকা (আর কিয়ামতের দিন) পাল্লাতে ভারি হবে এবং তা আল্লাহ্র কাছে অতি প্রিয়। আর সে বাক্য দুটি হল :

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম। (বুখারী ও মুসলিম)

আরেক হাদীসে এরশাদ হয়েছে :

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্, নিরানব্বইটি রোগের ওষুধ, যার মধ্যে সবচাইতে সহজ (রোগটি) হল চিন্তা। (মেশকাত) অর্থাৎ, লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্-এর সামনে চিন্তার তো কোন অস্তিত্বই নেই—এবাক্যটি চিন্তাসহ এর চাইতে বড় বড় আরও ৯৮টি রোগের উপশম ঘটায়।

হযরত মকহুল (রহঃ) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি :

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ وَلَامَنْجَأَ مِنَ اللهِ اِلَّا اِلَيْهِ

লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি ওয়ালা মানজাআ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কষ্টের ৭০টি দরজা বন্ধ করে দেবেন, যার সর্বাপেক্ষা লঘুটি হল দারিদ্র্য।

হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনা—যখনই রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সামনে কোন পেরেশানীর বিষয় উপস্থিত হত, তখন তিনি :

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ

ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আসতাগীছু পাঠ করতেন। (মেশকাত)

যিকিরের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা দরূদ শরীফও বটে। এতে দুনিয়া ও আখেরাতের অমূল্য নেয়ামত অর্জিত হয়, বিপদাপদ ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, চিন্তা-ভাবনা অপসারিত হয়, দো'আ কবূল হয়। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক একবার আমার উপর দরূদ পাঠায় আল্লাহ্ তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন। দশটি পাপ (আমলনামা থেকে) কমিয়ে দেয়া হয়, তার দশটি স্তর বর্ধিত হয় এবং তার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়। (হিস্‌নে হাসীন)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার প্রতি অনেক দরূদ পাঠাই। আপনি বলে দিন, (আমার অন্যান্য যিকির-আযকারের হিসাবে) কি পরিমাণ দরূদ পাঠানো আমি নির্ধারণ করে নেব? তিনি বললেন, যে পরিমাণ ইচ্ছা নির্ধারণ করে নাও। আমি বললাম, সমস্ত যিকির-আযকারের চতুর্থাংশ কি দরূদ নির্ধারণ করে নেব? তিনি বললেন, যে পরিমাণ ইচ্ছা নির্ধারণ করে নাও। যদি বেশী নির্ধারণ কর, তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক দরূদ আর অর্ধেক অন্যান্য যিকির-আযকার নির্ধারণ করে নেব? তিনি বললেন, যে পরিমাণ ইচ্ছা নির্ধারণ করে নাও। যদি বেশী নির্ধারণ কর, তবে তা তোমার জন্য উত্তম। আমি নিবেদন করলাম, দুই তৃতীয়াংশ দরূদ আর এক তৃতীয়াংশ অন্যান্য যিকির-আযকার নির্ধারণ করে নেব কি? তিনি বললেন, যত ইচ্ছা নির্ধারণ কর, বেশী করলে তা তোমার জন্যই ভাল। আমি নিবেদন করলাম, (তাহলে) পুরো ওযীফা দরূদেরই রাখব। তিনি বললেন, এমনটি করলে তোমার (সমস্ত) ভাবনা-চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। (তিরমিযী)

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, নিঃসন্দেহে দো'আ আসমান ও যমীনের মাঝখানে আটকে থাকে; উপরে উঠে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তোমার নবীর উপর দরূদ প্রেরণ করবে। (তিরমিযী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি (একদিন মসজিদে) নামায পড়ছিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-সহ নবী করীম (দঃ) তখন (মসজিদে) উপস্থিত ছিলেন। (নামায শেষে) যখন আমি বসলাম তখন প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা করলাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করলাম, পরিশেষে নিজের জন্য দো'আ করলাম। এসব দেখে নবী করীম (দঃ) বললেন, চেয়ে নাও, তোমার চাহিদা পূরণ করা হবে; চেয়ে নাও, তোমার চাহিদা পূরণ করা হবে। (তিরমিযী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, যারা এমন কোন বৈঠকে বসে যাতে আল্লাহ্র যিকির এবং নিজেদের নবীর উপর দরূদ পাঠানো হয় নি, এ বৈঠক তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে আযাব দেবেন, আর ইচ্ছা করলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। (তিরমিযী)

ইস্তেগফারও আল্লাহ্র যিকিরের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এর ফযীলত ও উপকারিতা সম্পর্কে আগত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এখনই বর্ণনা করা হচ্ছে।

ইস্তেগফারের প্রতিদান ও ফল

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَّخْرَجًا وَّمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَّرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ — رواه احمد وابو داؤد وابن ماجة

(২৯) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইস্তেগফারে (আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনায়) নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেকটি সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসার (অব্যাহতি লাভের) পথ করে দেন এবং তাকে যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্তি দান করেন। তাছাড়া এমন জায়গা থেকে তাকে জীবিকা দান করেন, যার কল্পনাও সে করে না। (আহমদ, আবু দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্)

জ্ঞাতব্য ঃ ইস্তেগফার ও তওবার দ্বারা গুনাহ তো মাফ হয়ই সাথে সাথে দারিদ্র্য ও জটিলতা দূর হয় এবং নিরাপদ ও শান্তি-স্বস্তিময় জীবন লাভ হয়। কোরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ط وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ○ هود ايت ٣

অর্থাৎ, আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজেদের পালনকর্তার কাছে এবং তওবা কর তাঁর দরবারে যাতে তোমাদের জন্য লাভজনক হয় উত্তম লাভ নির্ধারিত সময় পর্যন্ত এবং যেন দান করা হয় প্রত্যেক (সৎকর্মী)-কে তার অধিক (সৎকর্মের বিনিময়ে)। পক্ষান্তরে যদি বিমুখ হও, তাহলে আমি আশঙ্কা করি তোমাদের উপর বিরাট দিনের আযাবের। (সূরা হূদ, আয়াত ৩)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বুস্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, সে ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে তার আমলনামায় বিপুল ইস্তেগফার (সঞ্চিত) পাবে। (ইবনে মাজাহ্)

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন ইস্তেগফার বিরাট কাজে লাগবে। যে যতটুকু ইস্তেগফার করবে ততটুকুই নিজের আমলনামায় মজুদ পাবে এবং ইস্তেগফারাধিক্য কিয়ামতের দিন কাজে লাগবে।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, শয়তান মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে বলল, হে পরওয়ারদেগার! আপনার ইয্‌যতের কসম, আপনার বান্দাদের রূহ যে পর্যন্ত তাদের

দেহের ভেতরে থাকবে, আমি ক্রমাগত তাদেরকে প্ররোচিত করতেই থাকব। এর উত্তরে মহান পরওয়ারদেগার বললেন, আমার ইয্‌যত, পরাক্রম ও সুউচ্চ মর্যাদার কসম, আমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকবে। (আহমদ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মু'মিন বান্দা যখন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কাল বিন্দু পড়ে যায়। বস্তুত যদি তওবা ও ইস্তেগফার করে নেয়, তাহলে অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি তওবা-ইস্তেগফার না করে; বরং পরবর্তীতে সে পাপ বাড়িয়ে দেয়, তাহলে সে বিন্দুও বাড়তে থাকে এমন কি, তা গোটা অন্তরকে গ্রাস করে ফেলে (অর্থাৎ, গোটা অন্তরকে আবৃত করে ফেলে), সুতরাং এটিই হল সে মরিচা (আয়াতে) যার আলোচনা করা হয়েছে যে, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○ অর্থাৎ, কখনো (এরূপ) নয় (যেমন তারা বলে,) বরং তাদের অন্তরে তাদের (গর্হিত) কার্যকলাপের মরিচা ধরেছে। [আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে আহমদ]

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) সততই তাঁদের উম্মতদেরকে তওবা-ইস্তেগফারে উৎসাহিত করেছেন এবং তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক লাভ ও ফল সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর উম্মতকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ○ لا يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ○ لا وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ○ط نوح ايت ١٠-١٢

অর্থাৎ, ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজেদের পালনকর্তার কাছে, নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের প্রতি পাঠাবেন মুষলধারার বৃষ্টি এবং তোমাদের সাহায্য করবেন ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তানের মাধ্যমে। আর তোমাদের জন্য রচনা করে দেবেন উদ্যান এবং তোমাদের জন্য প্রবাহিত করবেন নদী। (সূরা নূহ, আয়াত ১০—১২)

এমনি উপদেশ ও ওয়াদা দান করেছিলেন হযরত হূদ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে। কোরআনে তা এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا

وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ —— هود ايت ٥٢

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়, নিজেদের পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে পাপ ক্ষমা করিয়ে নাও। তারপর তওবা কর তাঁর দরবারে। তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠিয়ে দেবেন এবং তোমাদেরকে দান করবেন ক্ষমতার উপর ক্ষমতা। (সূরা হূদ, আয়াত ৫২)

আল্লাহ্ তা'আলার নিষ্পাপ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) তাঁর বৈঠকে শতবার আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এভাবে নিবেদন করতেন—

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ —— مشكوة

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা কবূল কর; নিঃসন্দেহে তুমি তওবা কবূলকারী ও ক্ষমাশীল। (মেশকাত)

লক্ষ্য করার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বৈঠকে শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, অথচ আমরা সর্বক্ষণ পাপে লিপ্ত থাকা সত্ত্বে একবারও ক্ষমা প্রার্থনা করি না।

হযরত হুযায়ফাহ (রাঃ) বলেন, (একবার) আমি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কাছে নিবেদন করলাম, আমার মুখ খুব চলে। (কাজেই আমাকে এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা বাতলে দিন।) মহানবী (দঃ) বললেন, তুমি ক্ষমা প্রার্থনায় লেগে যাও না কেন? [(হিস্‌নে হাসীন) অর্থাৎ, ইস্তেগফারকে অপরিহার্য করে নাও। তাহলেই মুখের তীব্রতা প্রশমিত হয়ে যাবে।]

হাদীস শরীফে আরও আছে, ফরয নামাযের সালাম ফিরিয়ে মহানবী (দঃ) তিনবার ইস্তেগফার করতেন। (মেশকাত)

এতে বুঝা যাচ্ছে, সৎকর্ম করার পরেও ইস্তেগফার করা উচিত, যাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

সদকা-খয়রাতের মাধ্যমে বিপদ-বালাই কেটে যায়

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ —— رواه الترمذى

(৩০) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, সদকা-খয়রাত আল্লাহ্ তা'আলার রাগকে প্রশমিত করে এবং অপমৃত্যুকে রোধ করে। (তিরমিযী)

দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য সদকা-খয়রাতও বিরাট অমোঘ প্রতিকার। হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, সদকা আল্লাহ্ তা'আলার রাগকে প্রশমিত করে। অর্থাৎ, পাপানুষ্ঠানের দরুন বান্দারা দুনিয়া ও আখেরাতে যে বিপদাপদ ও ধ্বংসের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল, সদকার মাধ্যমে তা থেকে নিরাপত্তা অর্জিত হয় এবং সদকা পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত বনে যায়। তাই পাপের দরুন ধরপাকড় হয় না। তাছাড়া এতে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষ প্রশমিত হয়ে যায়। আর সদকা অপমৃত্যু রোধ করার যে কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ হল এই যে, সদকা দানকারী মুসলমানের অবস্থা মৃত্যুর সময় খারাপ হয় না। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরে শৈথিল্য আসে না, মুখ থেকে মন্দ বাক্য বের হয় না এবং মন্দ পরিণতি থেকে নিরাপদ হয়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি; কিন্তু সদকা হালাল অর্থ-সম্পদ থেকে হওয়া অপরিহার্য।

দোযখের আযাব থেকে বাঁচানোর ব্যাপারেও সদকার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ

فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ —— بخارى و مسلم

অর্থাৎ, দোযখের আগুন থেকে বাঁচ, তা এক টুকরা খেজুর সদকার মাধ্যমে হলেও। (বুখারী ও মুসলিম)

وَعَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادِرُوْا بِالصَّدَقَةِ فَاِنَّ الْبَلَاءَ لَايَتَخَطَّاهَا —— رواه رزين

(৩১) হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, সদকাকে ত্বরান্বিত কর। কারণ, একে ডিঙ্গিয়ে বিপদ আসবে না। (রাযীন)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, সদকা একটি মজবুত দেয়ালরূপে দাঁড়িয়ে যায়, আর আসন্ন বিপদাপদকে সেটি প্রতিরোধ করে। বিপদের এমন শক্তি নেই যে, সদকার লৌহ যবনিকা ডিঙ্গিয়ে পৌঁছে যাবে! হাদীসের দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হল যে, বরাবর সদকা দিতে থাকা কর্তব্য, যাতে আসন্ন বিপদ দমে যায় এবং আপদ-বালাই থেমে যায়। সাধারণত মানুষের মাঝে রেওয়াজ রয়েছে যে, তারা বিপদ পড়লে দান-খয়রাতের দিকে মনোনিবেশ করে। তাদের প্রতি নসীহতস্বরূপ বলছি, সতত

সদকা-খয়রাত করতে থাকুন যাতে বিপদাপদ আসতেই না পারে। অবশ্য ঠিক বিপদের সময় সদকা করাও উপকারী হয়ে থাকে ; কিন্তু পূর্ব থেকে সদকা না করার দরুন যে বিপদ এসে যায়, তার অল্পবিস্তর কষ্ট ভোগ করতেই হয়। টাকা-পয়সা, খাদ্য-বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় বস্তু-সামগ্রী আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশে অভাবগ্রস্তদেরকে দান করার নামই সদকা। মানুষ নিজের মনগড়াভাবে যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে যে, নির্দিষ্ট বিপদ এলে শুধু গোশতই বিতরণ করব কিংবা বৃষ্টি না হলে যব-গম-চালের দলাই বিতরণ করব অথবা এ ধরনের যে সব শর্তাশর্ত ও বৈশিষ্ট্য প্রচলিত রয়েছে, শরীঅতে সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। শুধু সদকা তাৎক্ষণিকভাবে যাই জুটে তাই বিপদাপসারণের কারণ হতে পারে।

وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصِّنُوْا اَمْوَالَكُمْ بِالزَّكٰوةِ وَدَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَاسْتَقْبِلُوْا اَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ — رواه ابو داؤد فى المرسل

(৩২) হযরত হাসান (রাঃ) থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের অর্থ-সম্পদের সংরক্ষণ কর, সদকার মাধ্যমে নিজেদের রোগের প্রতিকার কর (অর্থাৎ, সদকা দান কর যাতে রোগ-বালাই প্রতিহত হয়ে যায়) এবং বিনয় ও রোনাযারীর মাধ্যমে বিপদ-বালাইর তরঙ্গকে স্বাগত জানাও (অর্থাৎ, বিপদ-বালাই উপস্থিত হলে দো'আ প্রার্থনা এবং আল্লাহ্‌র সামনে রোনাযারীর মাধ্যমে বিপদের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে পড়। তাহলে তা পালিয়ে যাবে)। (আবু দাউদ)

এ হাদীসের দ্বারা বুঝা গেল, যাকাত আদায় করা হলে অর্থ-সম্পদ নিরাপদ থাকে। আর রোগের প্রতিকারের জন্য সফল ব্যবস্থাপত্র হল সদকা করা। আর আসন্ন বিপদের ঢেউয়ের মোকাবেলা করতে হবে আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটির মাধ্যমে। তাহলে বিপদ কেটে যাবে।

রোগ প্রতিরোধের জন্য শুধুমাত্র সদকাই যথেষ্ট। সামর্থ্য অনুযায়ী যতটা সম্ভব সদকা করবে। এর কোন পন্থা কিংবা বিশেষ বস্তু-সামগ্রী সদকা করার কথা শরীঅতে উল্লেখ নেই।

অনেকে রোগ প্রতিহত করার জন্য কোন জীব জবাই করে তার গোশত চিল-কাকদের খাইয়ে দেয় এবং বিশ্বাস করে, রোগটি গোশতের সাথে জড়িয়ে চলে গেল। এ বিশ্বাস ও পন্থা শরীঅত অনুযায়ী ভিত্তিহীন। পশু-পাখীর তুলনায় গরীব-মিসকীনের অধিকার বেশী।

ভূ-বাসীদের প্রতি রহম কর, আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করবেন

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ — رواه ابو داؤد والترمذى

(৩৩) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, তোমরা ভূমিতে বসবাসকারীদের প্রতি রহম (দয়া) কর, (তাহলে) আকাশবাসী (আরশের অধিকারী আল্লাহ্) তোমাদের প্রতি রহম করবেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ভূমিতে বসবাসকারী বলতে মানুষজন, পশু-পাখি, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, বিবি-বাচ্চা, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, এতীম-অনাথ, ফকীর-মিসকীন, বেওয়া-বিধবা, ঋণী-ঋণদাতা সবাই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ পাক রহমান ও রহীম। রহমকারীকে তিনি ভালবাসেন এবং তাদের প্রতি রহম করেন। আল্লাহ্ তা'আলার করুণা পাবার জন্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি রহম করা অত্যন্ত সফল ও কার্যকর ব্যবস্থা।

এক হাদীসে বলা হয়েছে, সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিবার। কাজেই সে-ই আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয়, যে তাঁর সৃষ্টির সাথে সদাচরণ করে।

(শো'আবুল ঈমানে বায়হাকী)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার তো আর সন্তানসন্ততি ও পরিবার-পরিজন নেই তাঁর সৃষ্টিই তাঁর পরিবার পর্যায়ভুক্ত। যে তোমাদের পরিবার-পরিজনের সাথে ভাল ব্যবহার করে, তোমরা যেমন সে লোকের প্রতি সন্তুষ্ট হও, তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সে লোক অধিক প্রিয়, যে তাঁর সৃষ্টির প্রতি সদ্ব্যবহার করে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে লোক কোন অসহায় লোকের ফরিয়াদে সাড়া দেয়, আল্লাহ্ তার জন্য তিহাত্তরটি মাগফেরাত (ক্ষমা) লিখে দেবেন, যার একটি হবে তার যাবতীয় কর্ম সম্পাদন ও সংহত করার জন্য আর বাহাত্তরটির মাধ্যমে কিয়ামতের দিন তার মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটবে। (শো'আবুল ঈমানে বায়হাকী)

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

لَايَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَّايَرْحَمُ النَّاسَ — بخارى ومسلم

অর্থাৎ, যে লোক মানুষের প্রতি রহম করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

মহানবী (দঃ) আরও এরশাদ করেছেন যে, বঞ্চিত মিসকীনদের খবরাখবর রাখা এবং তাদের সেবা প্রয়াসী ব্যক্তি (সওয়াবের দিক দিয়ে) সে লোকের মত, যে আল্লাহ্র রাস্তায় দৌড়ঝাঁপ করে। (রাবী বলেন, আমার মনে হয়, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন যে,) সে নামাযীর মত, যে সারা রাত (জেগে) নামায পড়ে, অথচ ক্লান্ত হয় না এবং সে রোযাদারের মত, যে ক্রমাগত রোযা রাখতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

আখেরাতান্বেষিগণ একাগ্রতা লাভ করেন

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهٗ طَلَبَ الْاٰخِرَةِ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهٖ وَجَمَعَ لَهٗ شَمْلَهٗ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَّ مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهٗ طَلَبَ الدُّنْيَا جَعَلَ اللهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَتَّتَ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ وَلَايَأْتِيْهِ مِنْهَا اِلَّا مَاكُتِبَ لَهٗ — رواه الترمذى وَزَادَ فِىْ رِوَايَةٍ فَلَا يُمْسِىْ اِلَّا فَقِيْرًا وَلَايُصْبِحُ اِلَّا فَقِيْرًا وَمَااَقْبَلَ عَبْدٌ عَلَى اللهِ بِقَلْبِهٖ اِلَّا جَعَلَ اللهُ قُلُوْبَ الْمُؤْمِنِيْنَ تُنْقَادُ اِلَيْهِ بِالْوُدِّ وَالرَّحْمَةِ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ خَيْرٍ اِلَيْهِ اَسْرَعَ — جمع الفوائد

(৩৪) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন, আখেরাত অর্জন যার উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরকে সমৃদ্ধ করে দেন এবং চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে তার অন্তরকে একাগ্রতা দান করেন। দুনিয়া তার কাছে অপমানিত হয়ে আসে। পক্ষান্তরে দুনিয়া অর্জন যার উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহ্ তার সামনে দারিদ্র্যকে এগিয়ে দেন এবং তার কাজকর্মে পেরেশানী সৃষ্টি করে দেন। অথচ সে দুনিয়া ততটুকুই পায়, যতটুকু তার ভাগ্যে থাকে। (তিরমিযী)

অপর এক রেওয়ায়তে এটুকু বর্ণনা অধিক রয়েছে যে, (দুনিয়ান্বেষী) সন্ধ্যায় ফকীর হয় আর ভোরেও ফকীর হয়। (কারণ, যতই উপার্জন করুক, তাতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। তার চাহিদা বাড়তেই থাকে। ভাবনা-চিন্তা তাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না।) আর যে বান্দা আন্তরিকভাবে আল্লাহ্র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়, মু'মিনদের করুণা ও প্রীতিপূর্ণ অন্তরগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি আকৃষ্ট করে দেন এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ যথাশীঘ্র তার কাছে পৌঁছে দেন। (জমউল ফাওয়ায়েদ)

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মানুষ! তুমি আমার এবাদতের জন্য মুক্ত হয়ে যাও, আমি তোমার অন্তরকে সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ করে দেব। (তাতে হাত শূন্য থাকলেও অন্তর সমৃদ্ধ থাকবে) আর তোমার মুখাপেক্ষিতাকে বন্ধ করে দেব (তাতে কোন প্রয়োজন আটকে থাকবে না)। আর যদি তুমি তা না কর (অর্থাৎ, আমার এবাদতের জন্য মুক্ত না হও), তাহলে তোমার হাতকে পরিব্যস্ততায় ভরে দেব (সর্বক্ষণ উপার্জনে মেতে থাকবে, নানান ধান্দায় ফেঁসে যাবে, তথাপি) তোমার মুখাপেক্ষিতা দূর করব না (যতই উপার্জন করবে মুখাপেক্ষীই হতে থাকবে)। (তিরমিযী)

মু'মিনের জীবনের উদ্দেশ্য হল শুধুমাত্র আখেরাতের জন্য উপার্জন করা এবং সেখানকার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রয়াস চালানো। যারা পরিপূর্ণ ঈমানদার এবং আখেরাতের প্রতিদান প্রাপ্তিতে দৃঢ় বিশ্বাসী, তারা গোটা জীবনকে আখেরাতের গঠনমূলক কাজের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। দুনিয়াতে থাকতে হলে যেহেতু পানাহার, প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ঘরবাড়ি নির্মাণও প্রয়োজন, সেজন্য তারা চলনসই কিছু না কিছু উপার্জন করেন এবং সে উপার্জনেও শরীঅতের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রতিদান ও সওয়াব প্রত্যাশী হয়ে যান। দুনিয়াদারীতে এমনভাবে মজে যান না যাতে আখেরাতের ক্ষতি হতে পারে। লেনদেনের ক্ষেত্রে হারাম, ধোঁকা-প্রতারণা, মিথ্যা ও খেয়ানত-আত্মসাৎ থেকে বেঁচে থাকেন। এ ধরনের বান্দাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা গায়েব থেকে করে দেন। দুনিয়া তাদের কাছে অপদস্ত হয়ে হাজির হয়। তাদের অন্তরে থাকে প্রশান্তি ও অভাবহীনতার ভাব। এ ধরনের বান্দাদের কোন প্রয়োজন স্বল্পদীর্ঘ সময়ের জন্য আটকে গেলেও সবর, শুকর, অল্পেতুষ্টি এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তিতে সন্তুষ্টির কারণে মনঃক্ষুণ্ণ, অস্থির ও উদ্বিগ্ন হন না।

পক্ষান্তরে দুনিয়াকেই যারা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশে পরিণত করে নেয়, দুনিয়ার জন্যই বাঁচে-মরে, তারই জন্য উপার্জন করে এবং ভোগ করে—চিন্তা-ভাবনা, প্রয়াস-পরিশ্রম, সুখ-দুঃখ এবং প্রবাস-নিবাস সবকিছু দুনিয়ার জন্যই

ওয়াক্ফ করে দেয়, তারা আল্লাহ্ তা'আলা থেকেও দূরে সরে যায়, আখেরাতের উচ্চমর্যাদা ও প্রতিদান এবং সওয়াব থেকেও বঞ্চিত থাকে। তাদের পার্থিব জীবনও অশান্তি-অস্বস্তিতে অতিবাহিত হয়। যতই উপার্জন করে নিক, অল্প মনে হয়। সর্বক্ষণ নিরানব্বইর (সম্পদ বৃদ্ধির) ফেরে পড়ে থাকে। মামলাবাজিতে লিপ্ত হয়ে তদবীর আর কর্মকর্তাদের তোষামোদে লেগে থাকে। ক্ষতি হলে কাঁদতে বসে যায়। লাভ হলে অধিকতর লাভের ভাবনায় লেগে যায়। ক্রমাগত কাজ আর কাজে নিমগ্ন থাকে। সম্পদের ঘাটতির ভয়ে প্রয়োজনীয় আরামও করতে পারে না। অনেক সময় সময়মত খাবার পর্যন্ত ভাগ্যে জুটে না। আর এসব সত্ত্বেও মনে করতে থাকে, আমরা অত্যন্ত অল্পই উপার্জন করেছি; প্রয়োজন পূরণের পরিমাণ এখনও হয় নি। বস্তুতই এ ধরনের লোকেরা উদ্বিগ্ন তো হয় সাথে সাথে সর্বক্ষণ কর্মব্যস্তও থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রের কাতারেও গণ্য হয়। কারণ, যখন অভাবই ঘুচল না, তখন তো অভাবগ্রস্তই বলতে হবে। অথচ যতটা পরিশ্রম ও কর্মব্যস্ততা সে পরিমাণ সম্পদ উপার্জন করে সমৃদ্ধ হয়ে নিশ্চিন্তে অভাব পূরণ হতে থাকাই উচিত ছিল; কিন্তু আখেরাতের প্রতি অনীহা প্রদর্শন এবং আল্লাহ্র যিকির ও তাঁর এবাদত-উপাসনা থেকে বিমুখ হয়ে পড়ার দরুন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কঠোর পরিশ্রম, স্বস্তিহীনতা, পেরেশানী, দারিদ্র্য, অন্তর্জ্বালা এবং মানসিক অস্থিরতার আযাবে লিপ্ত থাকে। অধিক পরিশ্রমে কিছুই হয় না, তকদীরে যা আছে, তাই পাওয়া যাবে। তারপরেও কেন দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে আখেরাতের ক্ষতি বরদাশত করতে হবে।

পার্থিব জীবন যত দীর্ঘই হোক সমাপ্ত হবেই, আর তার ধন-সম্পদ যত অধিকই হোক এক দিন বিচ্ছিন্ন হবেই। তা মৃত্যুর কারণে বিচ্ছিন্ন হোক কিংবা অপচয়ের মাধ্যমে। পক্ষান্তরে আখেরাতের জীবন কখনও শেষ হবার নয়। তার নেয়ামতরাজি চিরকাল থাকবে। মানুষের মাঝে সামান্যতম বুদ্ধি থাকলেও এ ধরনের বিষয় অবলম্বন করা কর্তব্য যা চিরকাল থাকবে। এমন বিষয়ের পেছনে পড়া, যা কোনক্রমেই নিজের কাছে চিরদিন থাকবে না—নির্বুদ্ধিতা নয় তো কি?

হাদীসে যে বলা হয়েছে, "যে লোক আখেরাতকে উদ্দেশ্য বানিয়ে নেবে, তার কাছে দুনিয়া নিজে থেকেই অপদস্ত হয়ে আসবে।" এর মর্মার্থ হল এই যে, আখেরাতান্বেষীরা অমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করে থাকে, আর পার্থিব বিত্ত-বৈভব তাদের কাছে এসে জড়ো হয়ে যায়। এর চাইতে অপদস্ততা আর কি হতে পারে, যে অনীহা প্রদর্শন করবে তারই কাছে গিয়ে পৌঁছায়?

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক তার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনাকে শুধুমাত্র এক চিন্তা অর্থাৎ, আখেরাতের চিন্তায় পরিণত করে নেবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার পার্থিব চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে যথেষ্ট হয়ে যান। পক্ষান্তরে যার চিন্তা-ভাবনা পার্থিব বিষয়াদির ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, আল্লাহ্ তার সম্পর্কে কোন পরোয়া করেন না, সে দুনিয়ার কোন্ গহ্বরে ধ্বংস হল। (আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ থেকে ইবনে মাজাহ্)

এ ধরনের লোক উভয় জায়গাতেই নিরাশ হয়। কারণ, আখেরাতান্বেষী তো হয়ই না যে, তা সে পাবে। আর পার্থিব চিন্তা-ভাবনায় জড়ানোর দরুন আল্লাহ্ পাকের সাহায্য ও রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে মারা গেল এবং যাকিছু উপার্জন করেছিল, তাও সাথে নিয়ে যেতে পারল না।

দুনিয়া অনেককে চায় আবার কেউ কেউ দুনিয়াকে চায়। যারা আখেরাত কামনা করে, দুনিয়া নিজে তার অন্বেষী হয়ে যায়। নিজেই তার জীবিকা পৌঁছে দেয়। পক্ষান্তরে যেসব লোক দুনিয়ার অন্বেষায় আত্মনিয়োগ করে, আখেরাত নিজে তাদের অন্বেষণ করে না। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু এসে তাদের গর্দান চেপে ধরে।

হযরত আবু সুলায়মান দারানী (রঃ) বলেন, যে অন্তরে আখেরাত থাকে, দুনিয়া তার সাথে ঝগড়া করতে থাকে এবং তার অন্তরের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে থাকে। পক্ষান্তরে যে অন্তরে দুনিয়া থাকে, আখেরাত তার সাথে বিরোধ করে না। কারণ, আখেরাত হল করীম (ভদ্র ও দয়ার্দ্র)। সে কারও ঘরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। আর দুনিয়া হল হীন চরিত্রের। প্রত্যেকের ঘরে জবরদস্তি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

মালেক ইবনে দীনার (রঃ) বলেন, তুমি যে পরিমাণ দুনিয়ার চিন্তা করবে, আখেরাতের সে পরিমাণ ভাবনাই তোমার অন্তর থেকে বেরিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তুমি যতখানি আখেরাত চিন্তা করবে, দুনিয়ার চিন্তা ততটাই তোমার অন্তর থেকে বেরিয়ে যাবে।

হযরত ইমাম গাযযালী (রঃ) বলেছেন, দুনিয়া চটুল রমণীর মত মানুষকে নিজের রূপ-লাবণ্যে আবদ্ধ করে নেয় এবং নিজের দুশ্চারিত্রিকতায় নিজের মিলনকামী-দেরকে ধ্বংস করে দেয়। নিজের অভিসারীদের কাছ থেকে পালিয়ে যায় এবং তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপে নিতান্ত কৃপণ। যদি (কখনও) আকৃষ্ট হয়, তবে তার সে আকর্ষণও বিপদশূন্য নয়। যে লোক তার ধোঁকায় পড়ে, তার পরিণতি হল অপমান। আর যে তার কারণে অহঙ্কার (প্রদর্শন) করে, সে অনুতাপ ও আক্ষেপের দিকেই এগিয়ে যেতে থাকে। যে তার কাছ থেকে পালায়, তার পশ্চাদ্ধাবন করে। যে তার সেবা করে, তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, আর যে তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করে, তার সাথে মিলনের চেষ্টা চালায়। তার পরিচ্ছন্নতার ভেতরেও থাকে

পঙ্কিলতা। তার আনন্দের ভেতরেও দুঃখ-বেদনা অপরিহার্য। তার আশীর্বাদের পরিণতি গ্লানি ও অনুতাপ ছাড়া কিছু নয়। দুনিয়া বড়ই প্রতারিকা, কুটিল ও পলায়ন-পরা এবং সহসা বিনাশকারিণী। সে তার অভিসারীদের জন্য বিপুল রূপ-লাবণ্য অবলম্বন করে এবং যখন সে ভাল করে ফেঁসে যায়, তখন ভেংচি কাটে। তার সুসংহত অবস্থাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। নিজের বৈচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদেরকে গরল পানে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়। কবি বলেছেনঃ

وَمَنْ يَّحْمَدِ الدُّنْيَا لِعَيْشٍ يَّسُرَّهٗ
فَسَوْفَ لَعَمْرِىْ عَنْ قَلِيْلٍ يَّلُوْمُهَا
اِذَا اَدْبَرَتْ كَانَتْ عَلَى الْمَرْءِ حَسْرَةً
وَاِذَا اَقْبَلَتْ كَانَتْ كَثِيْرًا هُمُوْمُهَا

অর্থাৎ, আর যে লোক দুনিয়ার আনন্দদায়ক জীবনের দরুন দুনিয়ার প্রশংসা করবে, আমি কসম খেয়ে বলছি, সামান্য কিছুকাল পরেই সে তার অখ্যাতিও করবে।

দুনিয়ার অবস্থা হল এই যে, যখন সে চলে যায় তখন গ্লানির দাগ রেখে যায়। আর যখন সে আসে, তখন তার ব্যাপারে অনেক চিন্তা-ভাবনা হয়।

পরহেযগারী ও তাওয়াক্কুলের ফলাফল

وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اٰيَةً لَوْ اَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ ط — رواه احمد وابن ماجة والدارمى

(৩৫) হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন, আমি এমন একটি আয়াত জানি, যার উপর আমল করলে তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। সে আয়াতটি হল—

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ ط وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط — طلاق أيت ٢-٣

অর্থাৎ, আর যে লোক আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য (দারিদ্র্য থেকে) বেরিয়ে আসার পথ সৃষ্টি করে দেন। এবং কল্পনাতীত স্থান থেকে তার জীবিকার ব্যবস্থা করে দেন। আর যে লোক আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। [সূরা তালাক, আয়াত ২ ও ৩ (আহমদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী)]

এটি সূরা তালাকের একটি আয়াত। এতে তাকওয়া (পরহেযগারী) ও তাওয়াক্কুল (ভরসা)-এর ফযীলত ও গুরুত্ব এবং এগুলোর উপকারিতা ও ফলাফল উল্লেখ রয়েছে। এতে প্রথমে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার জন্য যাবতীয় জটিলতা, দারিদ্র্য ও পেরেশানী থেকে বেরিয়ে আসার পরিষ্কার ব্যবস্থা করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তাকে জীবিকা দান করেন, যেখান থেকে তার জীবিকা প্রাপ্তির কল্পনাও থাকে না। তারপর বলা হয়েছে, যে লোক আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট হন। এটি কোরআনের আয়াত এবং আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা যা প্রকৃতই সত্য।

তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল দু'টি বিরাট বিষয়। এগুলোর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিই সুগঠিত ও বিন্যস্ত হয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জিত হয়। তাকওয়া কি? আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা, সগীরা ও কবীরা গুনাহ্ থেকে বাঁচা, সন্দেহজনক বিষয় থেকে নিরাপদ থাকা। অর্থাৎ, যেসব বিষয়ের বৈধাবৈধতার ব্যাপারে সন্দেহ হয় তাতে অবৈধতার দিককে অগ্রাধিকার দিয়ে তা থেকে বেঁচে থাকা। তাকওয়ার অনেকগুলো পর্যায় রয়েছে। বান্দা যে পরিমাণ তাকওয়া অবলম্বন করে, সে পরিমাণই আল্লাহ্ তা'আলার রহমত, সাহায্য ও বরকত সে লাভ করতে পারে।

এক হাদীসে মহানবী (দঃ) বলেছেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকী (পরহেযগার) -এর মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে না, যতক্ষণ না সে এমন সব বিষয় পরিহার করে, যেগুলো অবলম্বনে কোন ক্ষতি নেই। (আর তা এজন্য পরিহার করে যে, নাজানি এর কারণে) সে বিষয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে, যার অবলম্বনে ক্ষতি রয়েছে। (তিরমিযী) এটি বিরাট তাকওয়া। এর বরকতও অনেক।

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَّتَرُوْحُ بِطَانًا — رواه الترمذى وابن ماجة

(৩৬) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) থেকে শুনেছি, তোমরা যদি আল্লাহ্র উপর ভরসার মত ভরসা কর, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা এমনভাবে তোমাদেরকে জীবিকা দান করবেন যেমন করে পাখিদেরকে দান করেন। ভোরে ওরা ক্ষুধার্ত রওয়ানা হয় আর সন্ধ্যায় ভরপেট ফিরে আসে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্)

তাওয়াক্কুল (ভরসা)-এরও অনেক পর্যায় রয়েছে। সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের তাওয়াক্কুল হল, প্রকৃত রিযিকদাতা ও একক কর্মসম্পাদক আল্লাহ্ তা'আলাকে বুঝা এবং বিশ্বাস করা। আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক জীবিকা দান সম্পর্কে বিশ্বাস যত দৃঢ় হতে থাকে ততই তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উপায়-উপকরণ পরিহারের পর্যায় পর্যন্ত এসে যায়। যারা উপায়-উপকরণ পরিহার করেন, তারাও রিযিক প্রাপ্ত হন এবং ভাগ্যেরটি কোথাও যায় না। কিন্তু যেহেতু এটি বিরাট বিষয়; সবার সামর্থ্যের বিষয় নয়, তাই এর হুকুম দেয়া হয় নি। আমাদের সামনে আজও এমন বান্দা রয়েছেন, যারা শুধুমাত্র দ্বীন ও ধর্মের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন, অর্থ উপার্জনের কোন ব্যবস্থা তাঁদের নেই; কিন্তু তারপরেও তাঁদের চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। যেসব বান্দা শুধুমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করে নেন, অদৃশ্য পন্থায় আল্লাহ্র সৃষ্টিরা তাঁর প্রতি এগিয়ে আসে।

এক হাদীসে হুযূরে আকরাম (দঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক আল্লাহ্ তা'আলার কাছের বস্তু অর্জনে লেগে যায় আর আকাশ তার ছায়া হয়, যমীন তার বিছানা হয়, পৃথিবীর কোন বস্তু-সামগ্রীর ব্যাপারে তার ভাবনা না থাকে, এমন লোক ঘর-গৃহস্থালী ছাড়াই খাবার খেতে পারবে। বাগান রচনা না করেই ফল পাবে। আল্লাহ্র উপর যার (পরিপূর্ণ) ভরসা রয়েছে এবং তাঁরই সন্তুষ্টির অন্বেষায় যে নিয়োজিত, আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমান এবং সাত যমীনকে তার জীবিকার যিম্মাদার বানিয়ে দেন। তাদের সবাই তাকে জীবিকা পৌঁছাতে সচেষ্ট থাকে। তাকে হালাল জীবিকা পৌঁছাতে ত্রুটি করে না এবং তিনি বিনাহিসাবে নিজের জীবিকা পূর্ণ করে নেন। (দুররে মনসূর)

উপায়-উপকরণ পরিহার বিরাট ব্যাপার। উপায় অবলম্বন করেও নিজের এ বিশ্বাস সুদৃঢ় রাখাও অমোঘ বিষয় যে, জীবন ও মরণ, রহমত ও বরকত, সাহায্য ও কর্মসম্পাদন সবই আল্লাহ্র হাতে, শত্রুর উপর বিজয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই লাভ হয়, মান-অপমান আল্লাহ্রই অধিকারে, দুঃখ-বেদনার অবসান আল্লাহ্রই কাজ, লাভ-ক্ষতির মালিক তিনিই, সমস্ত মানুষ, যাবতীয় উপায়-উপকরণ এবং সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্র সামনে তুচ্ছাতিতুচ্ছ, তিনি শত্রুকে বন্ধু বানাতে পারেন, ক্ষতিকারক

বস্তু-সামগ্রীকে নিজের বান্দাদের সেবায় নিয়োজিত করতে পারেন। এ বিশ্বাস জাগ্রত হয়ে যাওয়াও বিরাট সাফল্যের ব্যাপার। সর্বকর্মে ও সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র আল্লাহ্র সত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাঁকেই সবকিছু বিবেচনা করা বিপদাপদ অপসারিত করে দেয়, সতত যাবতীয় কর্ম সম্পাদিত হতে থাকে। সাফল্য ও কৃতকার্যতার দুয়ার খুলে যেতে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলার নবীগণ যে কোন কঠিন সময়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছেন। তাঁরা শত্রুদেরকে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, তোমরা যাকিছু করতে পার করে নাও, আমাদের ভরসা আল্লাহ্র উপর। কোরআনে করীমে মহান আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে তাদের তাওয়াক্কুল ঘোষণার বিবরণ দেয়া হয়েছে। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উপর মুশরেক ও কাফেরদের পক্ষ থেকে নানা রকম কষ্ট এসেছে। তিনি আল্লাহ্রই উপর ভরসা রেখে দৃঢ়তার পাহাড়ের মতই অটল রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাওয়াক্কুলের (ভরসার) শিক্ষা দান প্রসঙ্গে বলেছেন—

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ۙ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○ — توبة أيت ١٢٩

অর্থাৎ, সুতরাং ওরা যদি বিমুখ হয়, তাহলে (হে মুহাম্মদ) বলে দিন, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট; তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি শুধুমাত্র তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তিনি মহান আরশের অধিপতি। (সূরা তওবা, আয়াত ১২৯)

আল্লাহ্র দরবারে চাহিদা উপস্থাপন করলে জটিলতা অপসারিত হয়

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَّزَلَتْ بِهٖ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تَسُدُّ فَاقَتُهٗ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهٖ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ فَيُوْشِكُ اللّٰهُ لَهٗ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ اَوْ اٰجِلٍ — رواه الترمذى

(৩৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ক্ষুধার সম্মুখীন হয়েছে,

সে যদি নিজের ক্ষুধার কথা (পরিস্থিতির ভাষায় কিংবা মুখের ভাষায়) মানুষের কাছে প্রকাশ করে অভাব পূরণের আবেদন জানায়, তাহলে তার ক্ষুধা প্রশমিত হবে না। পক্ষান্তরে যে ক্ষুধার সম্মুখীন হয়ে নিজের অভাবের কথা আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থাপন করে, আল্লাহ্ তা'আলা শীঘ্র অথবা (সামান্য) বিলম্বে তাকে রিযিক দান করবেন। (তিরমিযী)

আল্লাহ্ তা'আলারই সত্তা মুশকিল কুশা (জটিলতার অবসানকারী), অভাব পূরণ-কারী, রিযিকদাতা ও কর্মসম্পাদক। যাবতীয় অভাব-অভিযোগ তাঁর সামনে উপস্থাপন করা এবং যাবতীয় বিপদ অবসানের জন্য তাঁকেই ডাকা কর্তব্য। মানুষ একে তো অভাবগ্রস্ত ও মুখাপেক্ষী, আর যাকিছু তাদের কাছে রয়েছে তাও নিতান্ত অল্প। তদুপরি মানসিকতার দিক দিয়ে তারা কৃপণও বটে। কারও সামনে অভাব -অনটনের কথা বললে, ক্ষুধার কথা প্রকাশ করলে সে দিক বা না দিক যাচ্ঞাকারী অহেতুক অপদস্ত হলো। যদি সামান্য কিছু দিয়েও দেয়, কত দিন তা চলবে? প্রয়োজন তো বারবারই আসে, কে কত দেবে? তাই প্রকৃত মালিক ও রায্যাককে ছেড়ে অসহায়, মুখাপেক্ষী বান্দাদের দুয়ারে ধরনা দেওয়া একান্তই বোকামী। আল্লাহ্‌র কাছে চেয়ে সব অভাব পূরণ কর। সৃষ্টির কাছে চাইলে কখনও অভাব পূরণ হবে না; চিরকাল ভিক্ষুক হয়ে থাকবে। এক হাদীসে আছে—

وَلاَفَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ اِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ

অর্থাৎ, যে বান্দা ভিক্ষার দরজা খুলে দেয়, আল্লাহ্ তার জন্য দারিদ্র্যের দরজা খুলে দেন। (এটি একটি বড় হাদীসের অংশবিশেষ, আবু কাবশাহ (রাঃ) থেকে তিরমিযী রেওয়ায়ত করেছেন।)

অবশ্য কোন কোন অবস্থায় মানুষের কাছে যাচ্ঞা করার অনুমতিও দেয়া হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ্ ব্যতীত কারও কাছে কোন কিছু যাচ্ঞা না করাই শ্রেয়।

হযরত আবু যর (রাঃ)-কে মহানবী (দঃ) বললেন, তুমি কারও কাছে কিছুই চাইবে না। এমন কি বাহনে চড়ে সফর করতে গিয়ে তোমার চাবুকটি পড়ে গেলে নেমে নিজেই তা তুলে নেবে। (কাউকে) এরূপ বলবে না যে, "চাবুকটি একটু তুলে দাও তো।" (মেশকাত)

মানুষের কাছে নিজের ক্ষুধা ও অভাব-অনটনের কথা গোপন রাখা খুবই কার্যকর ব্যবস্থা।

এক হাদীসে আছে, যার কোন প্রয়োজন দেখা দিল কিংবা ক্ষুধা পেল এবং সে তা মানুষের কাছে গোপন রাখল, তাহলে তাকে এক বছরের হালাল রিযিক দান করা আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হয়ে গেল।

এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সামান্য রিযিক পেয়েই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'আলাও সামান্য আমলেই তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। (শো'আবুল ঈমান থেকে মেশকাত)

যে ছাপোষা লোক অভাবগ্রস্ত হয়েও মানুষের কাছে যাচ্ঞা করে না, তার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছেঃ

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ بِالْعِيَالِ — رواه ابن ماجة

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সে মু'মিন ফকীর বান্দাকে ভালবাসেন যে সন্তান-সন্ততির অধিকারী হয়েও সওয়াল করা (ভিক্ষাবৃত্তি) থেকে বিরত থাকে। (ইবনে মাজাহ্)

বিপদাপদ ও কষ্ট মু'মিনের জন্য রহমতস্বরূপ

একথাও জেনে রাখা প্রয়োজন যে, বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট শুধু শাস্তি চাখাবার জন্যই আসে না; বরং মু'মিন বান্দাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে আখেরাত গঠন করতে এবং আখেরাতের আযাব থেকে নিরাপদ রাখার জন্যও আসে। যেমন, কাফেরদের নেয়ামত প্রাপ্তি ঢিল দিয়ে হঠাৎ পাকড়াও করার জন্য হয়ে থাকে, তেমনিভাবে বিভিন্ন কষ্টের আগমন মু'মিনদের জন্য রহমতের কারণ হয়ে থাকে। নিম্নে এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকল্পে তিনটি হাদীস লেখা হচ্ছে। এরই সঙ্গে সমাপ্ত হয়ে যাবে চল্লিশ হাদীসের এ সংকলনটি । আল্লাহ্ তওফীকদাতা।

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَايُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَّلاَوَصَبٍ وَّلاَهَمٍّ وَّلاَحَزَنٍ وَّلاَاَذًى وَّلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ — رواه البخارى و مسلم

(৩৮) হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মুসলমানের উপর যে কোন দুঃখ-অবসাদ, ক্লান্তি, চিন্তা-ভাবনা, কষ্ট কিংবা অস্বস্তি উপস্থিত হয় এমন কি (যদি) একবার কাঁটাও বিঁধে যায়, তাহলে অবশ্যই এসবের বিনিময়ে আল্লাহ্ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لَاُخْرِجُ اَحَدًا مِّنَ الدُّنْيَا اُرِيْدُ اَغْفِرُ لَهٗ حَتّٰى اَسْتَوْفِىَ كُلَّ خَطِيْئَةٍ فِىْ عُنُقِهٖ بِسُقْمٍ فِىْ بَدَنِهٖ وَاَقْتَارٍ فِىْ رِزْقِهٖ — رواه رزين

(৩৯) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমার ইয্যত ও পরাক্রমের কসম, যে বান্দাকে আমি ক্ষমা করতে চাই, তাকে দুনিয়া থেকে বের করে নেয়ার (অর্থাৎ মৃত্যুর) পূর্বে তার ঘাড়ে যে সমস্ত গুনাহ (-র বোঝা) রয়েছে সেগুলোকে তার দেহে রোগ সৃষ্টি করে এবং তার রিযিকে সংকীর্ণতা সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষমা করে দেই। (রাযীন)

وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهٖ حَتّٰى يُوَافِيَهٗ بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ — رواه الترمذى

(৪০) হযরত আনাস (রাঃ) থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর বান্দার প্রতি কল্যাণ করার ইচ্ছা করেন, তখন পৃথিবীতেই তাকে আযাব দিয়ে দেন (যাতে করে এখানেই তার পাপ ক্ষমা হয়ে যায়)। আর আল্লাহ্ তা'আলা যখন বান্দাকে অকল্যাণে লিপ্ত করতে চান, তখন তার পাপের দরুন যেসব বিপদ আসার থাকে, সেগুলোকে আটকে রাখেন। এমন কি কিয়ামতের দিন তার পাপসমূহের পুরোপুরি শাস্তি দেবেন। (তিরমিযী)

এসব হাদীসের দ্বারা পরিষ্কার প্রতীয়মান হল যে, বিপদ ছোট হোক কি বড় মু'মিনদের জন্য সেগুলোও নেয়ামতস্বরূপ। এমনিতে আল্লাহ্র কাছে তো সর্বদাই কল্যাণ প্রার্থনা করা প্রয়োজন, বিপদ কামনা করা উচিত নয়; কিন্তু যখন কোন দৈহিক কিংবা আর্থিক অথবা বৈষয়িক কষ্ট এসে উপস্থিত হয়, তখন সওয়াব প্রাপ্তির দৃঢ় আশা এবং পাপের প্রায়শ্চিত্তের একান্ত বিশ্বাসসহ ধৈর্যের সাথে সহ্য করে নেয়া উচিত।

আল্লাহ্ তা'আলার কত বিরাট দয়া ও করুণা যে, দুনিয়ার নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী জীবনে পাপের দরুন দুঃখ-কষ্ট দিয়ে নিজের মু'মিন বান্দাদেরকে পাপ থেকে

পূত-পবিত্র করে তুলে নেন এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে হায়াতে তায়্যেবাহ (পরিচ্ছন্ন জীবন) বানিয়ে দেন। যাকে মৃত্যুর পর কঠিন ঘাটিসমূহের বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হয়েছে এবং জান্নাতের নেয়ামতে ভূষিত করা হয়েছে, সে বড়ই সফল ব্যক্তি। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে মু'মিন বান্দাদের জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের রীতি তৈরি করে আখেরাতের আযাব থেকে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকর্তা ও মালিক, বিপদাপদের জন্য সওয়াব না দেয়ার এবং একে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না বানানোর এবং প্রত্যেক পাপের শাস্তিই আখেরাতে দেয়ার অধিকারও তাঁর রয়েছে। কিন্তু তিনি একান্তই নিজের দয়া ও করুণায় আখেরাতের আযাবসমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আলহামদু লিল্লাহ্।

এক হাদীসে মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, যে কোন মুসলমানের রোগ-বালাইর মাধ্যমে কোন কষ্ট উপস্থিত হলে সে কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহসমূহ ঝরিয়ে দেন, যেমন, গাছ তার পাতা ঝরায়। (বুখারী ও মুসলিম)

হুযূর (দঃ) এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে যখন বান্দাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন (বিশেষ) মর্যাদা নির্ধারিত হয়ে যায়, যা সে নিজের আমল দ্বারা অর্জন করতে পারে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা দেহ, সম্পদ কিংবা সন্তান-সন্ততির উপর বিপদ পাঠিয়ে তাকে তাতে লিপ্ত করে দেন এবং অতঃপর তাকে ধৈর্যও দান করেন। তাতেকরে সে মর্যাদার সে স্তরে উন্নীত হয়ে যায়, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। (আহমদ ও আবু দাঊদ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, মু'মিন পুরুষ ও মহিলার জান-মাল ও সন্তানদের উপর সততই বিপদাপদ আসতে থাকে, এমন কি সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হয় যে, তার উপর কোন পাপই থাকে না। (তিরমিযী)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেছেন, যখন বান্দাদের গুনাহ অনেক হয়ে যায় এবং প্রায়শ্চিত্ত করার মত আমল থাকে না, তখন তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কষ্টে পতিত করে দেন, যাতে পাপসমূহের প্রায়শ্চিত হয়ে যায়। (আহমদ)

হযরত আমের (রাঃ) রেওয়ায়ত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সামনে রোগ-ব্যাধির আলোচনা হলে তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে মু'মিন বান্দাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যখন রোগ-ভোগের পর সুস্থ করে দেন, তখন সেটি তার অতীত পাপ-সমূহের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতের জন্য হয় উপদেশ (যাতে সে পাপ

থেকে বেঁচে থাকে এবং পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পুনরায় রুগ্ন হয়ে পড়ার অপেক্ষা না করে)। আর নিঃসন্দেহে মুনাফেক যখন রোগ-ভোগের পর সুস্থ হয়ে উঠে, তখন রোগের কষ্ট ভোগ ছাড়া আর কিছুই তার ভাগ্যে থাকে না। না প্রায়শ্চিত্ত হয়, না কোন উপদেশ লাভ করে। যেমন, উটওয়ালা উটকে বেঁধে রাখে এবং পুনরায় (দড়ি খুলে) ছেড়ে দেয়। সে বুঝতেই পারে না, কেন বাঁধল, কেন ছাড়ল। (রাবী বলেন, সে বৈঠকে) একটি লোক (উপস্থিত ছিল। শুনে) বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো জানিই না রোগ কি? (কারণ, রোগ আমার কাছেই আসে না।) মহানবী (দঃ) বললেন, (উঠ) আমাদের কাছ থেকে সরে যাও। কারণ, তুমি আমাদের দলের নও। [(আবু দাউদ) অর্থাৎ, তুমি যদি মু'মিন হতে, তাহলে অসুস্থও হতে এবং পাপের কাফফারার পর জান্নাতের নেয়ামত প্রাপ্তির অধিকারীও হয়ে যেতে। যখন ঈমানই নেই তখন আখেরাতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রয়েছ। আর দুনিয়ায় দুঃখ-কষ্ট দিয়ে আখেরাতের আযাব শেষ করার প্রয়োজন নেই।]

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, মু'মিনের দৃষ্টান্ত (যব ও গম) ফসলের মত। বাতাস বরাবর খেতের ফসলকে নোয়াতে থাকে। (তেমনি) মু'মিনের উপর সতত বিপদ আসতে থাকে। আর মুনাফেকের দৃষ্টান্ত হল পাইন গাছের মত (যা সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসে) নুয়ে পড়ে না, (কিন্তু) একবার সমূলে উপড়ে দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

একবার মহানবী (দঃ) রোগশয্যায় শায়িতা মহিলা সাহাবী উম্মে সায়েব-এর খবরাখবর নিতে উপস্থিত হলেন। মহানবী (দঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাঁপছ কেন?" বললেন, জ্বর হয়েছে; তার ধ্বংস হোক! হুযূর (দঃ) বললেন, জ্বরকে মন্দ বলো না। কারণ, তা (মু'মিন) মানুষদের পাপকে এমনভাবে নিঃশেষ করে দেয়, যেমন আগুনের চুল্লি বা ভাটা লোহার মরিচাকে নিঃশেষ করে দেয়। (মুসলিম)

অন্য আরেক সাহাবীকে দেখতে গেলে (তাকে জ্বরে ভুগতে দেখে) বললেন, সুসংবাদ শোন! কারণ! আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, জ্বর হল আমার আগুন, যা আমি দুনিয়াতে মু'মিন বান্দাদের উপর চাপিয়ে দেই, যাতে আখেরাতের আগুনের বদলা হয়ে যায়। (আহমদ ও ইবনে মাজাহ্)

একবার মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, সবচাইতে বেশী বিপদ কার উপর আসে? উত্তরে মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সবচাইতে বেশী বিপদ নবীগণের উপর আসে, তারপর (তাঁদের পরে) যে যে পরিমাণ (আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক ও নৈকট্যে) বড় মর্যাদার অধিকারী হয়, তাকে ধর্মীয় মর্যাদা অনুপাতে বিপদে লিপ্ত করা হয়। সুতরাং সে যদি নিজের ধর্মে

কঠোর হয়, তবে (আরও বেশী) কঠিন করে দেয়া হয়। আর যদি ধর্মে দুর্বল হয়, তবে তার জন্য সহজ করে দেয়া হয়। সারকথা, এমনিভাবে কষ্ট সহ্য করতে করতে মাটির উপর এমন অবস্থায় বিচরণ করতে থাকে যে, (প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবার কারণে) তার একটি গুনাহ্ও অবশিষ্ট থাকে না। (তিরমিযী)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, মহানবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে বড় সওয়াব বড় বিপদের সঙ্গে রয়েছে। আর এতেও সন্দেহ নেই যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়কে পছন্দ করে নেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করে দেন। (কাজেই বিপদে) যে ব্যক্তি (আল্লাহ্র প্রতি) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্যে (আল্লাহ্ তা'আলার) সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে অসন্তুষ্ট হবে তার জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি। (মেশকাত)

■

শেষ কথা

এখন আমরা পুস্তকখানি সমাপ্ত করব। বিগত পৃষ্ঠাগুলোতে যেসব আয়াত ও হাদীস উদ্ধৃত করা হল, তাতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, পার্থিব বিপদাপদ ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা মানুষের কর্মের ত্রুটির দরুনই আসে। সে বিপদ শাস্তি দেয়ার জন্যই আসুক কিংবা পাপের কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হিসাবেই আসুক, পাপ করার কারণেই আসে। তাই মু'মিনের কর্তব্য হল পাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং কোন পাপ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে নেয়া, যাতে বিপদের ধারা বন্ধ হয়। তারপর যেসব বিপদ আসবে, তা হবে ঈমানের পরীক্ষা কিংবা মর্যাদা বৃদ্ধির উপায়, যাতে এক সুখানুভূতি ও স্বাদ থাকবে।

মুখে আস্তাগফিরুল্লাহ্ বললে এবং তওবা তওবা করলেই তওবা হয় না। বরং তওবার তাৎপর্য হল, অতীতে কৃত পাপসমূহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় ইচ্ছা করা যে, এখন থেকে আর আল্লাহ্র অবাধ্যতা করব না। তারই সাথে সাথে আল্লাহ্র হক যতখানিই বিনষ্ট হয়ে থাকুক সেসবগুলো আদায় করতে হবে। যেমন, যত নামায কাযা হয়ে থাকবে, সেসব হিসাব করে পড়তে হবে। পঞ্চাশ বছরের হলেও প্রতিদিন যথাসম্ভব বেশীর চাইতে বেশী বিগত নামায আদায় করতে শুরু করে দেবে, যদিও জীবনভর কাযা পড়ে শেষ করা না যায়। আর যদি বিগত নামায পড়তে পড়তে মৃত্যু এসে যায়, তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ্ তার অনুতাপের কারণে ক্ষমা করে দেবেন। তেমনিভাবে সম্পদের যাকাত আদায় করবে। যদি পঞ্চাশ বছরের হয় তবুও সেসব আদায় করবে। যদি রোযা ছুটে গিয়ে থাকে, তাহলে সেগুলোও যথাশীঘ্র কাযা রেখে নেবে। আর তাছাড়াও যেসব ফরয কিংবা ওয়াজিব পরিত্যাগ করেছে, কাযা করতে হয়, তা আদায় করবে।

তেমনিভাবে বান্দার হকগুলো ভেবে-চিন্তে দেখবে, কাদের হক রয়েছে, কাদের গীবত করা হয়েছে কিংবা কাদেরকে অপমান করা হয়েছে অথবা কখনও কারও কোন কিছু চুরি বা খেয়ানত করে থাকলে অথবা কেউ কোন বস্তু-সামগ্রী বা ঋণ প্রভৃতি দিয়ে ভুলে গিয়ে থাকলে অথবা কাউকে গালি দিয়ে থাকলে কিংবা অন্যায়ভাবে মারধর করে থাকলে অথবা অন্য কোন কিছু অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ

করে থাকলে, এক কথায় ভাল করে চিন্তা-ভাবনা করে সব রকম হকের তালিকা তৈরি করে সবাইকে তা আদায় করতে হবে। যেসব আর্থিক হক থাকবে, সেগুলো অর্থের দ্বারা আদায় করবে। আর যদি মারধর করে থাকে, তবে তার কাছে গিয়ে বলবে, ক্ষমা করে দাও অথবা বদলা নিয়ে নাও। যদি কারও গীবত করে থাকে কিংবা কোনভাবে অপমান করে থাকে, তাহলে ক্ষমা চেয়ে নেবে। হক আদায় করতে এবং ক্ষমা চাইতে গিয়ে সাক্ষাতের অপেক্ষা করবে না ; বরং কোন যাতায়াত -কারীর হাতে অথবা ডাকযোগে অথবা নিজে গিয়ে হক আদায় করবে এবং ক্ষমা চেয়ে নেবে। এমন করতে গেলে লোকেরা হয়তো পাগল বলবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র ব্যাপারে পাগল হওয়াই বিচক্ষণতা বটে।

আমরা যদি সৎকর্মে সজ্জিত হই এবং আমানতদারী, সততা, সত্যবাদিতা, আল্লাহ্র আনুগত্য আর রাসূলের পায়রবীকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নেই, পাপ বর্জন করি এবং অন্যদেরকে পাপ থেকে বিরত করে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে থাকি, তাহলে সাফল্য ও কৃতকার্যতা অর্জিত হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার রহমত, সহায়তা এবং নেয়ামত ও বরকতের অধিকারী হতে পারব। আমরা আজও আল্লাহ্ তা'আলার রহমত, বরকত ও সাহায্য হাসিল করতে পারব। কিন্তু আল্লাহ্র ওয়াস্তে বলুন, তাঁর নেয়ামতের অধিকারী কে? সে কি, যে তাঁর কোরআন থেকে, তাঁর রাসূল থেকে, তাঁর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাঁর নির্দেশাবলীকে পশ্চাতে ফেলে— فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ -এর বাস্তব চিত্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যার দুঃখজনক অস্তিত্বই আজ অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণে সব চাইতে বড় অন্তরায়?

যার অন্তরে ইসলামের মহব্বত রয়েছে এবং যে ইসলামের মহত্ত্ব ও উত্থানাকাঙ্ক্ষী, তার উচিত, কিতাবুল্লাহ্ ও নবীর হাদীস অনুযায়ী আমল করাকে জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বানিয়ে নেয়া। কারণ, এভাবেই দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য ও কৃত-কার্যতা হাসিল হতে পারে। আমরা নিজেদের অসৎকর্মের দ্বারা আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করে নিজেদের কৃতকর্মের ফল পেয়ে গেছি, তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁকে অসন্তুষ্ট করে তার পরিণতি ভোগ করেছি। সুতরাং শেষ কথা এটাই বলতে হয় যে, আসুন এখন পুনরায় তাঁর দরবারে অবনমিত হই, নিজেদের ভুল-ভ্রান্তির জন্য অনুতপ্ত হই, নিজেদের ক্ষুব্ধ অপ্রসন্ন আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করে নেই, তাঁর সত্য ও নিষ্ঠাবান উপাসক হয়ে যাই, তাঁর নির্দেশ মোতাবেক আমল করি, তাঁর দ্বীনকে প্রসারিত করি, ইসলামের মহিমাকে অব্যাহত রাখার জন্য দেহমন ও বিত্ত-বৈভবের বাজি লাগিয়ে দেই, নিজেদের পূর্বপুরুষদের হৃত

গৌরবকে পুনরুদ্ধার ও সজীব করে তুলি। তাহলে আর সে দিন দূরে থাকবে না, যখন হারানো সম্মান ফিরে আসবে, পেরেশানী আর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পাল্টে যাবে।

এমন কথা বলার লোক তো অনেক আছে যে, সমস্ত পেরেশানী ও বিপদাপদ আমাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের পরিণতি; কিন্তু এরই সাথে সাথে একথাও উপলব্ধি করে নেয়া কর্তব্য যে, শুধু পাপ স্বীকার করলেই বিপদ-বালাই ও দুঃখ-কষ্ট কেটে যাবার স্বপ্ন দেখা নিরেট নির্বুদ্ধিতা। আসলে এসবই শুধু মৌখিক কথা। অন্তরে কিন্তু একথা নেই যে, আমাদের কৃতকর্মই এসব বিপদাপদ ডেকে এনেছে। এ ধরনের চাটুকাররা হয়তো নিজেকে সৎ মনে করে আর অন্যদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে। অথচ মানুষকে সর্বাগ্রে নিজের অন্তরের খবর নেয়া উচিত। স্বীকার করার সাথে সাথে মন্দ কর্ম পরিহার করাও জরুরী। আমরা বরাবরই মহান পরওয়ার-দেগারের হুকুম-আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করছি, অথচ শান্তি-শৃংখলা এবং আরাম আয়েশেরও আকাঙ্খা পোষণ করছি; কিন্তু তা এক অলীক কল্পনা—নিজে অবাধ্যতায় নিয়োজিত থাকব আর আল্লাহ্র কাছ থেকে দয়া ও করুণা যাচ্ঞা করব। যেন আল্লাহ্র দায়িত্ব শুধু দয়া-করুণা করা; কিন্তু আমাদের দায়িত্বে পাপ সম্পাদন ছাড়া আর কিছু নেই! (নাঊযুবিল্লাহ্)

কারও কারও সামনে যখন এ বিষয়গুলো পেশ করা হয়, তখন তারা এগুলো অস্বীকার করে বলে, আমাদের পাপের কারণে যদি আমাদের উপর বিপদাপদ এসে থাকে, তাহলে কি কারণ থাকতে পারে যে, অমুক দেশ বা জায়গার লোকদের উপর সে বিপদাপদ আসে নি, যা আমাদের উপর এসেছে, তারাও তো আমাদেরই মত গুনাহগার? এ প্রশ্ন একান্তই অবান্তর। এটা কি কোন অপরিহার্য যে, সবার উপর এবং সর্বত্র একই সময়ে বিপদ এসে যাবে! তাছাড়া এটাও জরুরী নয় যে, সবাই একই রকম বিপদে লিপ্ত হবে। সময়ে সময়ে ধাপে ধাপে সব দেশে এবং সব অঞ্চলেই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিপদ আসতে থাকে, যা বিচিত্র ও বিভিন্ন হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় কয়েকটি দেশকে একই সময়ে একই রকম কোন বিপদের সম্মুখীন করে দেয়া হয়। ভূমিকম্পের আগমন, প্লাবনে ধ্বংস হয়ে যাওয়া, বৃষ্টি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা অনেক বেশী হয়ে যাওয়া, পঙ্গপালের আক্রমণে শস্যভূমির উজাড় হয়ে যাওয়া, বৃষ্টি-বাদলের ঝড় আসা, রেলের সংঘর্ষ, বিমানের পতন, সরকারসমূহের তছনচ হয়ে পড়া, মড়ক ব্যাধি (কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালিরিয়া ইত্যাদি)-এর বিস্তার প্রভৃতি এমন সব বিপদ ও পেরেশানী, যা সমস্ত দেশেই দেখা দেয়।

কারো মনে এ সংশয়ও আসতে পারে যে, বুঝি বাহ্যিক উপায়-উপকরণ পরিহার করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। এমনটি ভাবা ভুল। বিপদ অপসারণের জন্য শরীঅতের সীমায় থেকে বাহ্যিক উপায়-উপকরণ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা শুধু জায়েযই নয়; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ফরযের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। ব্যবস্থা তো সবাই অবলম্বন করে; কিন্তু যেহেতু সবচাইতে বড় ব্যবস্থা (অর্থাৎ, আল্লাহ্র হুকুম-আহকামের অনুবর্তিতা এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার) থেকে বিরত থাকে। তাই বাহ্যিক ব্যবস্থাসমূহও ব্যর্থ হয়ে যায়। আর যদি কোন অবস্থায় সফল হয়ও, তাহলে অন্য কোন বিপদ এসে উপস্থিত হয়।

পরিতাপের বিষয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বিষয়ের উপর শান্তি-স্বস্তি ও কল্যাণ-বরকতকে নির্ভরশীল করে দিয়েছেন, সেগুলো অবলম্বন করার কথা আমাদের কল্পনাতেও আসে না। পার্থিব ব্যবস্থা ও উপায়াদি প্রচুর পরিমাণে অবলম্বন করে দেখে নিয়েছি; কিন্তু বিপদ-বিড়ম্বনা হ্রাসের পরিবর্তে দিন দিন তা কেবল বৃদ্ধিই পাচ্ছে। জানি না, এখন আর কিসের অপেক্ষা যে, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অবনত হচ্ছি না!

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَاۤءَ اَشْرَاطُهَا فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَاۤءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ

وَاِذْ قَدْ وَصَلْنَا اِلٰى هٰذَا الْمُقَامِ بِتَوْفِيْقِ اللهِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ نَخْتِمُ مِسْكَ الْخِتَامِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى التَّمَامِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى نَبِيِّهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ الْجَانِّ وَالْاَنَامِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا بِهُدَاهُ وَاتَّبَعُوْهُ فِى اللَّيَالِىْ وَالْاَيَّامِ

■ সমাপ্ত ■